সাহিত্য-চিন্তা

অমরেন্দ্র, পঞ্চ-পুষ্প, লহরী, আভা প্রভৃতি গ্রন্থ

রচয়িত্রী

পণ্ডিতা কুমুদিনী বসু

প্রণীত।

প্রকাশক

শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু

৪নং কোর্টহাউস্ রোড্, ঢাকা।

মূল্য ॥০ আট আনা।

ভূমিকা

"ভারত-মহিলা" ও "সেবকে" গ্রন্থকর্ত্রী যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে কয়েকটি প্রবন্ধ ও তাঁহার রচিত অমরেন্দ্র নামক উপন্যাস হইতে কয়েকটি বিষয় উদ্ধৃত করিয়া 'সাহিত্য-চিন্তা' নামে এই গ্রন্থ প্রকাশিত করা হইল।

বাঙ্গালা-সাহিত্য-জগতে পণ্ডিতা কুমুদিনী বসু সুপরিচিতা। তাঁহার রচিত 'অমরেন্দ্র' 'আভা' 'লহরী' 'পঞ্চ-পুষ্প' প্রভৃতি গ্রন্থ ইতঃপূর্ব্বে শিক্ষিত সমাজ বিশেষ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। আশা করি সাহিত্য-চিন্তাও তদ্রূপ আদৃত হইবে।

ভাষার মাধুর্য্য, ভাবের উচ্চতা এবং চিন্তার প্রগাঢ়তা 'সাহিত্য-চিন্তার' প্রত্যেক প্রবন্ধে প্রতিফলিত হইয়াছে। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ লেখক ও লেখিকাগণের মধ্যে পণ্ডিতা কুমুদিনীর আসন কোথায় কি ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইবে বিজ্ঞ পাঠকগণই তাহা স্থির করিবেন। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে গ্রন্থকর্ত্রী বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডার ইচ্ছানুরূপ পূর্ণ করিবার পূর্ব্বেই অকালে অমরধামে গমন করিয়াছেন। তিনি যে উদ্দেশ্যে প্রবন্ধগুলি লিখিতেছিলেন, ইহার কোন একটি প্রবন্ধ দ্বারা সেই উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎমাত্রও সফল হইলে তাঁহার অমর আত্মা পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিবে, সন্দেহ নাই।

৪নং কোর্টহাউস্ রোড, ঢাকা
ভাদ্র, ১৩২২ সন

শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু।

সূচী

		পৃষ্ঠা
১।	ভারতে নারীর উন্নতি ...	১
২।	সমাজ ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার...	১১
৩।	আলোক	২৫
৪।	শ্রেষ্ঠ শিক্ষালয়	৩৮
৫।	সূর্য্য-মণ্ডল ...	৪৫
৬।	সার্ব্বভৌমিক প্রেম... ...	৬০
৭।	ছায়া-পথ	৭০
৮।	প্রকৃত বন্ধুতা	৭৮
৯।	আর্য্যজাতির পতনের কারণ ...	৮৮
১০।	সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব	৯৬
১১।	জ্ঞান	১০৮

স্বর্গীয়া কুমুদিনী বসু

সাহিত্য-চিন্তা

ভারতে নারীর উন্নতি

ভারত পুণ্যভূমি। ভারতের প্রতি রেণুকণা পুণ্য পবিত্রতাময়। যখন সরস্বতী দৃষদ্বতী ও ভাগীরথীর পবিত্র পুলিন প্রতিধ্বনিত করিয়া "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ধ্বনি উত্থিত হইত;—"ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মধ্যানে, ব্রহ্মানন্দ রসপানে" ভারতবাসীর হৃদয় নবজীবন পথের মধ্যাহ্ন সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত ছিল; সামবেদের পবিত্র গাথা দিক্ দিগন্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়া বিদেশবাসীর প্রাণও বিমুগ্ধ করিত; সেই সময় ভারতনারীর কি অবস্থা ছিল? তাঁহারা কি নিদ্রিতা ছিলেন? না।—নারী শক্তিরূপিণী। নারী অবসাদে অচৈতন্য থাকিলে দেশ শক্তি সঞ্চয় করিবে কোথা হইতে? মহা চেতনার বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারে

—জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মের নিত্য উদ্বোধনে, দেশবাসী উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে কেমন করিয়া ?

ভারতের যশস্বিনী দুহিতাগণও যে তখন গৌরবের বিশ্ববিমোহিনী বিজয় বৈজয়ন্তী বহন করিয়া মহিমার আলোকে প্রদীপ্ত হইতেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অতীত যুগের পুরাণ, কাব্য ও শাস্ত্রাদি একবাক্যে তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বাণীর পবিত্র অর্ঘ করে লইয়া ভারতের পুত্রকন্যাগণ সমভাবে বিশ্বনাথের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইতেন। সে অর্ঘ কি ?— জ্ঞান। জ্ঞানের সফলতা কোথায় ?—ভক্তিতে। প্রকৃত পক্ষে সেই সুবর্ণযুগে ভারতরমণী জ্ঞান ও ভক্তিতে জগতের বরণীয়া ছিলেন। নারীজাতি পুরুষের তুল্য অধিকার লাভ করিয়া স্বাধীনতা এবং শিক্ষার অমূল্য রত্নে বিভূষিতা, এ দৃশ্য কেমন সুন্দর, কেমন কল্যাণকর ! ভারতের জ্ঞান ভাণ্ডারের দর্শন, বিজ্ঞান জ্যোতিষ, অধ্যাত্ম তত্ত্ব,—কোন্ শাস্ত্রে নারী প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই ! বেদের অনেক শ্লোক ভারতের অসামান্যা ধীশক্তিসম্পন্না কুললক্ষ্মীগণের জ্ঞানভক্তি-বিরচিত। জড় বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব, অধ্যাত্ম-তত্ত্বের নিগূঢ় ব্যাখ্যায় তাঁহাদের অনেকে দিবানিশি রত থাকিতেন।

প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রাজর্ষি জনক যখন মিথিলার রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যোগধর্ম্ম এবং সংসারধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিতেছিলেন, সেই সময় রাজশক্তি এবং ব্রহ্মশক্তি অপূর্ব্ব পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। একদিকে অলৌকিক শৌর্য্যবীর্য্যের বিশ্বমুগ্ধকারী আলোকরশ্মি,—অপর দিকে জ্ঞান, যোগ ভক্তি বৈরাগ্যের মহিমান্বিত শক্তি সঞ্চারিণী প্রতিভা। উভয় প্রবল শক্তির সামঞ্জস্য বিধান করিয়া রাজর্ষি জনক ভারতবর্ষে জগৎপূজ্য এক পুণ্যময় মহাশক্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই শুভদিনে, মাহেন্দ্রযোগে, নারী-প্রতিভার কি প্রকার বিকাশ সাধিত হইয়াছিল তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে একটি ঘটনা বিবৃত করিতেছি।

সুলভা নাম্নী এক ব্রহ্মবাদিনী যোগধর্ম্মাবলম্বিনী মহিলার বিষয় বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। সাক্ষাৎ স্বর্গীয় অগ্নির ন্যায়—মূর্ত্তিমতী তপস্যার ন্যায়—সেই বরণীয়া নারী ধর্ম্মের জ্যোতিতে স্বদেশ আলোকিত করিয়া আনন্দে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেন। তাঁহার উন্নত প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের জ্ঞানপ্রভা অনেক পুরুষ হৃদয়কেও পুণ্যালোকে আলোকিত করিয়াছিল। একদিকে যেমন তিনি ব্রহ্ম-সমাধি-যোগে অনেক সময় নিমগ্ন থাকিয়া

অক্ষয় পরমানন্দের অধিকারিণী ছিলেন, অপর দিকে হৃদয়নিঃসৃত স্নেহামৃতে সকল জীবকুল অভিষিক্ত করিতেন। তিনি ব্রহ্মযোগে অবস্থিত থাকিয়াও সেবাধর্ম্মের নির্ম্মল বারি সমভাবে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র বিতরণে রত ছিলেন। সেইহেতু তিনি সময় সময় আপন পুণ্যাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া নানা স্থানে গমন করিতেন।

গৌরবের মণিমুকুটে বিমণ্ডিত হইয়া রাজর্ষি জনক স্বীয় রাজসভাতে নিয়ত নানা দেশীয় জ্ঞানী. যোগী, ভক্তে পরিবৃত থাকিতেন। নানা দিক্ প্রবাহিনী স্রোতস্বিনীর নির্ম্মল প্রবাহের ন্যায় বিবিধ ধর্ম্মতত্ত্বের তর্ক বিতর্ক এবং আলোচনার স্রোত সেই সুরম্য সভাতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। সেই স্থানে বিদুষী ধর্ম্মশীলা ললনা-রত্নের আবির্ভাবেরও অপ্রতুলতা ছিল না। যোগতত্ত্ব এবং সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে রাজর্ষি তাঁহাদের নিকটও অনেক শিক্ষা লাভ করিতেন।

একদিন রাজর্ষি সভাস্থলে পণ্ডিতমণ্ডলী এবং মহর্ষিগণ সহ সৎপ্রসঙ্গে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন এমন সময় ব্রহ্মবাদিনী সুলভা সেই স্থানে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার অপরূপ রূপ-আভা ভক্তি ও জ্ঞানালোকে মিশ্রিত হইয়া রাজসভাকে কি এক অপূর্ব্ব শ্রী সম্পন্ন করিয়া তুলিল।

সভাস্থিত সকলে শ্রদ্ধাভরে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, কিন্তু কেহ বিস্মিত হইলেন না। কারণ প্রকাশ্য রাজসভাতে বিদুষী কুলমহিলার সমাগম সেই মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের দিনে কাহারও বিস্ময়ের বিষয় ছিল না। নারী মাতৃ-রূপিণী, কল্যাণ-রূপিণী ; তাঁহার সমাগম, সকল স্থানেই ভক্তি শ্রদ্ধা এবং পুণ্য-প্রবাহ বৃদ্ধির কারণ। সেই পুণ্যশীল ভারতসন্তানগণ কল্যাণময়ী নারীর আবির্ভাবে কেনই না আনন্দ লাভ করিবেন ?

রাজা বিশেষ সম্মানপূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া আসন প্রদান করিলেন। সুলভা সভাস্থিত মহর্ষিগণ এবং মহারাজ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত ও প্রশংসিত হইয়া যেন প্রভাত অরুণ-রশ্মি বিকিরণপূর্ব্বক উপবেশন করিলেন।

মুনিগণ রাজর্ষিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ ! যেখানে মহা বিস্তৃত অরণ্যানী মহীরুহ সমূহে শোভিত হইয়া রহিয়াছে—ভীমদর্শন তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ সকল মেঘমালা ভেদ করিয়া শোভা পাইতেছে, সেই দেবাত্মা হিমাদ্রির নিভৃত কন্দরে যতিগণ আদিদেবের ধ্যানে নিমগ্ন সেই পুণ্যময় স্থানে এই শুভদর্শনা কল্যাণী বহুকাল অবস্থিতি করিয়া আপনার আত্মাকে পরমাত্মায় সংযোগ পূর্ব্বক তপস্যায় রত ছিলেন।"

অতঃপর রাজর্ষি জনক সুলভার সহিত গভীর ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

সুলভার মুখনিঃসৃত কয়েকটি অমৃতময় বাক্য ভারতের অমূল্য রত্ন মহাভারত হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

সুলভা কহিলেন—"আমি মোক্ষতত্ত্ব অবলম্বন পূর্ব্বক পরব্রহ্মে চিত্ত সমাধান করিয়া কাল যাপন করিতেছি। বৈরাগ্যই মোক্ষলাভের উৎকৃষ্ট উপায়। বৈরাগ্য জ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন হয়। জ্ঞান দ্বারা যোগাভ্যাস ও যোগাভ্যাস দ্বারা আত্মজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মনুষ্য আত্মজ্ঞান প্রভাবেই সুখদুঃখাদি পরিত্যাগ ও মৃত্যুকে অতিক্রমপূর্ব্বক পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারে। আমি সেই আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মোহ হইতে বিমুক্ত ও নিঃসঙ্গ এবং সুখদুঃখাদি পরিবর্জ্জিত হইয়াছি।"

সেই সময় সুলভার ন্যায় শত শত মহিলা জ্ঞান ধর্ম্মে ভারতভূমি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

হায়! পুণ্যময় ভারতে আজ নারীশক্তির কি ঘোরতর অবনতি সাধিত হইয়াছে? ইহার কারণ কি? কোন্ জন্মান্তরের নিদারুণ অভিশাপ নারীর মস্তকে বর্ষিত হইয়া তাহাকে জ্ঞানের উচ্চতর শিখর হইতে ধীরে ধীরে

অপহৃত করিল? এই চিন্তা অনেক সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তির হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে।

নারীজাতির উন্নতির মূলে আমরা তিনটী কারণ দেখিতে পাই। শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং শ্রদ্ধা।

প্রথমতঃ—শিক্ষার অভাবই নারীজাতির অবনতির প্রধান কারণ। শিক্ষা যে সকল উন্নতির মূল ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। নারী সমাজের অর্দ্ধেক অঙ্গস্বরূপ। নারী-শক্তি জাগ্রত না হইলে সমাজের পূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর নয়। উচ্চ শিক্ষা ভিন্ন নারীশক্তি কেমন করিয়া জাগ্রত হইবে! সমগ্র হিন্দুসমাজে নারীজাতির জ্ঞানোন্নতির পথ অবরুদ্ধ প্রায়! গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী প্রভৃতি আর্য্য নারীগণের এমন সমুজ্জ্বল জ্ঞানপ্রভা কোথা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল? উচ্চশিক্ষা কি তাহার প্রধান কারণ নয়? যেমন একটী বৃক্ষের অর্দ্ধ অঙ্গ ছেদন করিলে সেই প্রকাণ্ড মহীরুহ শক্তিহীন এবং শীঘ্রই প্রাণহীন হইয়া পড়িবে, তেমনি সমাজের অর্দ্ধ অঙ্গস্বরূপ নারীজাতির শক্তি বিনষ্ট হইলে সমগ্র সমাজ-দেহের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

শিক্ষা যেমন নারীজাতির উন্নতির মূল, স্ত্রীস্বাধীনতা তেমনই তাহার প্রাণ। কি শারীরিক, কি মানসিক,

কি সামাজিক, যে দিক দিয়াই কেন দেখি না বাধা পাইলে মানবাত্মার কোন প্রকারই বিকাশ লাভ হয় না। প্রাকৃতিক জগতে দেখিতে পাই, একটী বৃক্ষ যখন বীজ হইতে অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ করে, তখন যদি অঙ্কু-রোদ্গমের স্থানটি প্রস্তর দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখ, দেখিবে ঐ স্থানেই তাহার উন্নতি বন্ধ হইয়া গেল; প্রকৃতির স্বাভাবিক বর্দ্ধনশীলতার কার্য্য রোধ হইল। তারপর কি? তারপর মৃত্যু। প্রকৃতির উন্মুক্ত আলোক ও জলবায়ুতে ছাড়িয়া না দিলে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়। যে একদিন প্রকৃতির প্রসাদে মহা মহীরুহে পরিচিত হইত, বিকাশে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া শৈশবেই তাহার বিনাশ সাধিত হইল। প্রাকৃতিক জগতে যাহা জীব জগতেও ঠিক সেই নিয়ম। আধ্যাত্মিক জগতেও তাহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই না। শৈশব হইতেই যাহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ন্যায় অবস্থিতি করিতে হয়, তাহার মানসিক শক্তির সম্যক উন্মেষ কেমন করিয়া সাধিত হইবে! ভারতে মুসলমান রাজত্বের আবির্ভাব হইতেই নারীকে বিশেষভাবে অবরুদ্ধ করিয়া রাখার আবশ্যকতা সমাজ-নেতৃগণের হৃদয়ে প্রবলরূপে অনুভূত হইয়াছিল। স্বেচ্ছাচারপরতন্ত্রতার যুগে নারীজাতির

অবরোধ ভিন্ন তাহাদের মানসম্ভ্রম অব্যাহত রাখার উপায়ান্তর ছিল না। এখানেই নারীর উন্নতির স্রোত রোধ হইতে আরম্ভ করিল। সুবর্ণ যুগে কি অবরোধ প্রথা বর্ত্তমান ছিল না? রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থে নারীজাতির কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু আবশ্যক মত নারীগণ নির্ম্মুক্ত স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। যাঁহারা চির-কৌমার্য্য ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতেন সমাজে তাঁহাদের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। সেই সময়ে ভারতে বেদবতী প্রভৃতি জগৎপূজ্যা চির-কুমারী নারীর অভাব ছিল না। সাবিত্রী. রুক্মিণী, দময়ন্তী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীগণ যে স্বয়ংই স্বীয় স্বীয় পতি নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই সমস্ত ঘটনা কি পূর্ব্বকালে নারীজাতির স্বাধীনতার পরিচায়ক নহে? বলিতে গেলে স্ত্রী-স্বাধীনতাই নারীর উন্নতির প্রধান সহায়।

তৃতীয়তঃ—শ্রদ্ধা। ভারতবর্ষে নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধার অভাব নারীজাতির অবনতির একটী প্রধান কারণ। আর্য্যজাতি নারীকে কেমন শ্রদ্ধা করিতেন এবং সম্মানের চক্ষে দর্শন করিতেন তাহা অনেকেই অবগত আছেন। এবিষয়ে ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশসমূহ আদর্শ

স্থানীয়। নারীর মর্য্যাদা তাঁহারা বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়া থাকেন। আপনাদের গৃহলক্ষ্মীকে তাঁহারা দেবতার ন্যায় পূজা করেন বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। এজন্যই বর্ত্তমান সময়ে তাঁহারা জগতে বরণীয় হইয়া উঠিয়াছেন। একজন মহাপুরুষ বলিয়াছেন, যে দিন ভারতবাসী নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান হারাইয়াছে, সেই দিন হইতে তাহাদের দুর্গতির আরম্ভ; তাহাদের সৌভাগ্যলক্ষ্মী ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন।

ভারতবাসী যদি আপনার কল্যাণ ইচ্ছা করেন তবে নারীজাতিকে পুনর্ব্বার জাগ্রত করিতে চেষ্টা করুন! তাহাদিগকে উচ্চ শিক্ষা এবং আবশ্যক মত স্বাধীনতা প্রদান করিয়া জ্ঞানাভরণে ভূষিতা করুন—নারীজাতির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্পণ করুন! নতুবা আর মঙ্গল নাই—মহাবিনাশ হইতে রক্ষার আর উপায় নাই।

সমাজ-ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার

মানবের নিয়ন্ত্রিত, পরস্পর সমঞ্জসীভূত শক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জনশ্রেণীর নাম সমাজ। ইতর প্রাণীরা একত্র বিচরণ করে, একত্র কার্য্য করিয়া থাকে; তাহারাও আহার নিদ্রা প্রভৃতি প্রাকৃতিক অলঙ্ঘ্য বিধান পরম্পরার বশীভূত। কিন্তু তাহারা পরস্পর নিয়ম ও নীতি-শৃঙ্খলে আবদ্ধ নয়। তাহাদের মধ্যে বিশেষ কোন বাধ্যবাধকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। যেখানে কোন নীতি-সূত্রের গ্রন্থি নাই, শৃঙ্খলাযুক্ত নিয়ম বন্ধন নাই, তাহা সমাজ নামের যোগ্য নহে।

ভূবিজ্ঞানবিদ্ মনীষিগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, অর্দ্ধকোটিরও অধিক বৎসর পূর্ব্বে (মনুষ্য জন্মের বহু পূর্ব্বে) এই শ্যামাঙ্গিনী ধরণীতে কেবল ইতর প্রাণীরই একাধিপত্য ছিল। তাহারা জলে স্থলে আপনাদের পূর্ণ-প্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক বাস করিতেছিল। এই সুদীর্ঘকালেও তাহাদের মধ্যে জ্ঞানোন্নতির নিদর্শন এবং সমাজ-বন্ধনের কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় নাই। প্রতীচ্য পণ্ডিত মহাধীশক্তি সম্পন্ন ডারউইন্ বিবর্ত্তন-

শীলতার মধ্য দিয়া মনুষ্যজাতিকে বানরজাতির বংশ-সম্ভূত বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাহা যুক্তিযুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অনেকেই অস্বীকৃত।

নিতান্ত বর্ব্বর—সভ্যতার নাম মাত্র বর্জ্জিত জাতি-সমূহের মধ্যেও সমাজবন্ধন কোন না কোন আকারে দৃষ্ট হয়! তাহারা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে নৈতিক আদর্শ রক্ষা করে. কোন কোন বর্ব্বর জাতির সত্যপ্রিয়তা সুসভ্য জাতিকেও পরাস্ত করে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে মানবজাতি সমাজবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বহু গবেষণা দ্বারা বৈজ্ঞানিক-গণ প্রমাণ করিয়াছেন. দশ লক্ষ বৎসরেরও অধিক কাল ব্যাপিয়া মানবজাতি ফল-শস্যময়ী বসুন্ধরার অঙ্ক অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছেন। তখনও মাতা ধরিত্রী উজ্জ্বল সভ্যতা-লোকে আলোকিত হন নাই। সেই দীর্ঘকালব্যাপী ক্রমোন্নতির পর প্রায় লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যদিও আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ নিতান্ত অনুন্নত অবস্থায় বাস করিতেছিলেন, তথাপি তাঁহাদের মধ্যেও যে সমাজবন্ধন বিদ্যমান ছিল তাহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাঁহারা রীতিমত বস্ত্রাদি প্রস্তুত, কৃষিকর্ম্ম ও

নানাপ্রকার শিল্পকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ধীরে ধীরে সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিতেছিলেন।

মনুষ্যের হৃদয় সভ্যতার নির্ম্মল আলোকে যতই দীপ্ত হইতে আরম্ভ করে, সেই কিরণ-সম্পাতে সমাজগৃহের প্রতি কক্ষ হইতে ধীরে ধীরে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের অন্ধকার অপসারিত হয় এবং তাহার প্রত্যেক স্থান উন্নত এবং মার্জ্জিত হইয়া থাকে। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী।

জনসমাজের অবিরাম নিমেষ উন্মেষের মধ্যে যুগে যুগে কত প্রলয় বিপ্লব উপস্থিত হইয়া সমাজদেহ সজোরে আঘাত করিয়াছে; অপ্রতিহত কালস্রোতের নিয়ত ঘাত প্রতিঘাতে অনন্ত বিশ্ব-প্রকৃতির লীলা-নিকেতনে মানব-সমাজের বন্ধন সূত্রগুলি কখন কখন কিয়ৎপরিমাণে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়াও আবার সম্মিলিত হইয়াছে; বীণা যন্ত্রের তান্ লয়ের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ও ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের সমবেত সুর একটি আরাব-অপূর্ব্ব রাগে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

যে নীতি-সূত্রদ্বারা সমাজ গঠিত এবং রক্ষিত সেই সূত্রসমূহের মূল কোথায়? তাহাদের কেন্দ্র কি? কোন্ মধ্য বিন্দু হইতে উৎপন্ন হইয়া শত শত নীতি ও নিয়ম-

সূত্র মানবদেহের শিরা ধমনীর ন্যায় সমাজদেহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ও অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে? কে ইহাদিগকে জীবনী শক্তি প্রদান করিয়া থাকে? ধর্ম্মই সমস্ত নীতিসূত্রের মধ্যবিন্দু। যুগ যুগান্তরের সহস্র বাধা বিপ্লবের মধ্যে ধর্ম্মই সমজাকে জীবিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

যাহা চিরন্তন সত্য তাহা চিরদিনই স্বতঃসিদ্ধ; যাহা নিজ আলোকে সমুজ্জ্বল, সার্ব্বভৌমিক এবং নিত্য কল্যাণ-ময়, তাহাই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম সমাজ-হর্ম্ম্যের স্তরে স্তরে নানা আকারে ও নানা পরিচ্ছদে প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও তাহার মূল সত্যগুলি নিতান্তই সরল এবং স্বাভাবিক। এখানে দেশ কালের কোন প্রভেদ নাই,—জাতিগত বর্ণগত কোন বৈষম্য নাই। ইহার প্রকৃত স্বরূপ বাহিরে নহে,—ভিতরে।

যে ধর্ম্ম শুধু জাতিগত তাহা প্রকৃত ধর্ম্মের বহিরাবরণ মাত্র। যেমন হিন্দু ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, খৃষ্ট ধর্ম্ম ইত্যাদি। এই বহিরাবরণ লইয়াই পৃথিবীতে পৃথক পৃথক সমাজ গঠিত হইয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপে সকল জাতিই আপনাদিগকে সাম্প্রদায়িকতার পাষাণময় প্রাচীরে ঘেরিয়া লইয়াছে ও দুর্ণিবার কলহের সৃষ্টি করিয়াছে!

যেমন শারীরিক মঙ্গলকর নিয়মসমূহ লঙ্ঘনের ফলে জীবের পঞ্চভৌতিক দেহ নানা প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তেমনই ধর্ম্মের চির শুভকর নিয়ম ও নীতি-বিধান লঙ্ঘনের ফলে মানসিক অসংখ্য পাপ-ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। জনশ্রেণীর মানসিক ব্যাধিই সংক্রামক ভীষণ রোগের ন্যায় সমাজ-দেহের প্রতি শিরা ধমনীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং উহাকে শীঘ্রই বিকৃত ও বিনাশ করিতে উদ্যত হয়।

যে সকল গুরুতর ব্যাধি বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ-দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে অবসন্ন ও দুর্ব্বল করিতেছে, তাহার মধ্যে জাতি-বিদ্বেষই প্রধান। ইহা সমাজের প্রতি অঙ্গে প্রবেশ করিয়া তাহাকে একেবারে জীর্ণশীর্ণ করিয়াদিতেছে।

পৃথিবীর যে সকল জাতি সভ্যতা এবং জ্ঞানের আলোকে সকলের বরণীয় তাঁহাদের জাতীয় ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে জানা যাইবে যে প্রথমেই তাঁহারা সংকীর্ণতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া ভেদ-বিদ্বেষের প্রাচীর সকল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন; আপনাদের অশ্রান্তগতি অব্যাহত রাখিবার জন্য সকল বাধাই দূরে সরাইয়া রাখিয়াছেন; বিশ্বের নির্ম্মুক্ত জল, বায়ু, আলোক লাভ করিবার জন্য গৃহের সমস্ত গবাক্ষগুলি উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

সুবর্ণযুগের ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যায় সকল মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আর্য্যজাতি প্রেম ও আশ্চর্য্য সহানুভূতির দ্বারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত কি প্রকার ঐক্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কখনও জাতিবিদ্বেষকে সমাজের অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে দেন নাই। পূর্ব্বকালে এখনকার মত জাতিবিদ্বেষ প্রচলিত থাকিলে দাসী-পুত্র বিদুর এবং সূত্রধর-পুত্র কর্ণ সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিতেন না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের জাতীয় জীবন-গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠা তাহাদের উদারতা এবং অভেদ নীতির জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বানর, ভল্লুক, রাক্ষস, নাগ প্রভৃতি নামধেয় অনার্য্য জাতিদের সঙ্গে তাঁহারা সখ্যতা স্থাপন করিয়া, বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া, সাম্য মন্ত্রেরই কি মহিমা ঘোষণা করেন নাই?

উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে পরস্পর নৈকট্য ও সুম্মিলনের বাধা,—সংকীর্ণতার বাধা অপসারিত করিয়া দিয়া আর্য্যজাতি সর্ব্বদাই কর্ম্মক্ষেত্রে আপনাদের অপ্রতিহত গতির পরিচয় প্রদান করিতেন। একতা ও সম্প্রসারণ নীতির বলেই তাঁহারা জাতীয় দুর্জ্জয় প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই ভিন্ন ভিন্ন

অনার্য্যশ্রেণী দ্বারাও সমাজ পরিপুষ্ট ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। অতীত ইতিহাসের খণ্ড খণ্ড বিষয়গুলি দ্বারা তদানীন্তন জাতীয় জীবনের মূল উপাদান অনায়াসেই সংগ্রহ করিয়া লইতে পারা যায়। পূর্ব্বকালে বর্জ্জন-নীতি অপেক্ষা অর্জ্জন-নীতিরই সমধিক সমাদর ছিল। তাই নিম্ন জাতিসকল অনায়াসেই বিরাট আর্য্য-সমাজের অঙ্গীভূত হইয়াছিল এবং ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক অন্যান্য প্রদেশেও আর্য্য-প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

যে সময়ে ভারতীয় রাজনৈতিক গগন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমালায় অলঙ্কৃত ছিল, প্রলয় বিপ্লবকর বৈদ্যুতিক সংঘর্ষণের ন্যায় যখন রাজন্যগণের অব্যাহত বল বিক্রম, শৌর্য্য-বীর্য্যের পরস্পর সংঘর্ষণে কুরুক্ষেত্রের সমরভূমিতে কালানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, কালান্তক বিষাণ নিনাদিত হইয়া সমস্ত ভারতকে স্তম্ভিত করিয়াছিল, রাজশক্তি এবং জাতীয় স্বাধীনতার সেই পূর্ণ বিকাশের সময়েও আমরা সার্ব্বভৌমিক প্রেমের জ্বলন্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই। শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাই তাহার এক অকাট্য প্রমাণ। সেই সময় জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মযোগের কেমন সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছিল, গীতাগ্রন্থ তাহার সাক্ষীস্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

খৃষ্টের জন্মের সার্দ্ধ পঞ্চশত বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে যখন শাক্যসিংহ ভারতে অবতীর্ণ হইয়া সাম্য-মৈত্রীর বিজয় বৈজয়ন্তী গগনে উড্ডীন করিয়াছিলেন, তাহার প্রভা সুনীল মহাসমুদ্র অতিক্রম করিয়া দিক দিগন্তরে বিকীর্ণ হইয়াছিল। তাহার স্পর্শে তখন অভিশাপগ্রস্ত বলি-দৈত্যের ন্যায় জাতিবিদ্বেষ মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। মহর্ষি ঈশার আবির্ভাবের তিন শতাব্দী পূর্ব্বে যখন দিগ্‌বিজয়ী বীরবর আলেক্‌জাণ্ডার সদর্পে বহুতর সেনানী সমভিব্যাহারে ভারত-ক্ষেত্রে পদার্পণ করেন, সিদ্ধার্থ-প্রবর্ত্তিত আলোক-শিখার প্রভাব তখনও এদেশ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই।

চারিশত বৎসর গত হইয়াছে আর একবার বঙ্গের আকাশে প্রেমের চন্দ্রকলা উদিত হইয়া সমস্ত ভারত আলোকিত করিয়াছিল। যিনি সকল জাতি,—সকল বর্ণ—সর্ব্বশ্রেণীর লোককে সমভাবে ভাই বলিয়া বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন; যাঁহার প্রীতির মন্ত্রে সকলে মুগ্ধ হইয়াছিল, সেই চৈতন্যদেবের নাম আজও বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত, কিন্তু তাঁহার অভেদনীতি এখন কোথায়?

হিন্দুসমাজে বর্ত্তমান সময়ে আমরা কি দেখিতে

পাই? ইহার উন্নতির অনেক দ্বারই কি সযত্নে রুদ্ধ করা হয় নাই? পক্ষান্তরে অবনতির উপায় সকলই অবলম্বন করা হইতেছে। সমাজের বক্ষ হইতে বাহিরে যাওয়ার শত শত পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিবার পথ একেবারেই বন্ধ। ইহাদ্বারা যে সমাজের শক্তি ক্ষয় হইয়া যাইতেছে এবং তাহার সম্প্রসারণ ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ কি? এই সকল অন্তরায় দূর না করিলে কিছুতেই সমাজের পূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর নয়। সংকীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া জাতীয় জীবন ধীরে ধীরে জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়।

আজ এই ধ্বংসদশাগ্রস্ত হিন্দু সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা প্রথমেই জাতি-বিদ্বেষ এবং অসংখ্য কুসংস্কারের অনিষ্টকারিতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি। কেবলই বাধা,—কেবলই অন্তঃসার শূন্য বিধিব্যবস্থা। এই সকল জটিল বিধিব্যবস্থা ও বাধা সমাজে অন্ধকারেরই সৃষ্টি করিতেছে—অনন্ত উন্নতির গতি রোধ করিয়া দিতেছে।

উচ্চশ্রেণীস্থ হিন্দুগণ নানা উপায়ে নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগকে পদানত রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। বিষম ভেদ বিদ্বেষ এবং জাত্যাভিমান

পরস্পরের মধ্যে নিদারুণ ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া দিতেছে।

প্রকৃতির রম্য নিকেতন প্রতি পল্লীগ্রামে এবং অশ্বগজ-সঙ্কুল ও জনকোলাহল-মুখরিত নগরে নগরে এই জাতি-বিদ্বেষ পূর্ণ মাত্রায় আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। দক্ষিণ ভারতবর্ষে পারিয়া প্রভৃতি পতিত জাতির দুর্গতির বিষয় কাহার অবিদিত আছে? বাঙ্গালা দেশেও নমঃশূদ্র প্রভৃতি নিম্ন জাতির দুর্দ্দশা দর্শন করিলে দুঃখ বোধ হয়। সমাজের এই নিম্নস্তরে—উন্নতির আলোক প্রবেশের পথে জাতিবিদ্বেষ উচ্চ পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থিত।

ইহার ফলস্বরূপ এই নিম্ন জাতীয় ব্যক্তিদিগের অসন্তোষও বৈশাখী সন্ধ্যার পশ্চিম আকাশস্থিত ঘনীভূত মেঘমালার ন্যায় ক্রমেই ঘনাইয়া উঠিতেছে এবং উচ্চ-শ্রেণীর সহিত সহানুভূতির সম্পর্ক দিন দিন ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। ইহা কি দেশের পক্ষে ঘোরতর অমঙ্গলের চিহ্ন নয়? যেমন কণা কণা বালুকা সঞ্চিত হইয়া একটি দ্বীপ গঠিত এবং অসংখ্য প্রস্তর রেণু দ্বারা একটি পর্ব্বত প্রস্তুত হয়, তেমনই দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্ত সমবেত শক্তিদ্বারা জাতীয় মহাশক্তি অর্জ্জিত হইয়া থাকে। ইহা হইতে অর্দ্ধেক বাদ দিলে সমাজ ছিন্নপত্র বৃক্ষের ন্যায়

নির্জীব হইয়া পড়িবে সন্দেহ নাই। মহামহীরুহ প্রকৃতি-রাজ্যে অনেক কাজ করে ; তৃণ সামান্য হইলেও তাহার কার্য্যকারিতা সামন্য নয়। স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র চণ্ডাল মিত্রকে সাদরে আলিঙ্গন করিতে এবং কিরাত জাতীয়া শবরীর আতিথ্য গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। কিন্তু যুগযুগান্তর পরে সেই ভারতের অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে ? তাঁহাদের বংশধরগণ আজ তথাকথিত নীচ জাতির ছায়াস্পর্শেও আপনাদিগকে অশুচি বোধ করেন।

হিন্দুসমাজের বৃহত্তর অংশই নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। জীবন-বীণার যে তারে কমলার বন্দনা-গীতি ধ্বনিত হইয়া উঠে তাহা সর্ব্বতোভাবে ইহাদেরই করধৃত। কৃষি, শিল্প. বাণিজ্য সমস্তই ইহাদের শরীরের রক্তে পরিপুষ্ট।

যেমন মানব দেহের কোন স্থান কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইলে ক্রমে তাহা সর্ব্ব শরীরে ছড়াইয়া পড়ে এবং অবিলম্বে তাহাকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়, সেইরূপ সমাজের এই নিম্নস্তর অনুন্নত অবস্থায় থাকাতে আমাদের জাতীয় জীবনের অন্তস্তলে যে কুঠারাঘাত পড়িতেছে তাহাতে কি সংশয় আছে ?

শত বাধা বিঘ্নের ভিতর হইতে, আজ সভ্যসমাজের মহাজাগরণের দিনে, বিশ্বের তন্ত্রীতে যে বিরাট উত্থান-সঙ্গীত ভৈরব রাগে বাজিয়া উঠিতেছে—প্রভাত-মলয়ানিলের মঙ্গল বার্ত্তার ন্যায় তাহা ভারতবর্ষের নিতান্ত অন্ধতম কূপেও প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তাই আজ নিম্নজাতির মধ্যে কেহ কেহ জাগ্রত হইয়া আপনাদের শোচনীয় দুর্দ্দশা দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছেন, এবং জগতের নিকট মনুষ্যের প্রাপ্য অধিকার প্রার্থনা করিতেছেন।

যদি হিন্দুগণ আপনাদের বিনষ্ট গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান হন—যদি জগতের নিকট বরণীয় শক্তিরূপে—যথার্থ মানুষরূপে, দাঁড়াইতে ইচ্ছুক হন, তবে দেশের এই কোটি কোটি নিম্নশ্রেণীস্থ পতিত ভ্রাতাদিগের হস্ত ধরিয়া অগ্রসর হউন। তাহাদের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দুর্গতি, অজ্ঞানতা দূর করিতে যত্নবান হউন; সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে ঐকান্তিক সহানুভূতি প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগকে গভীর প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করুন। নতুবা কে আমাদিগকে মহাবিনাশ হইতে রক্ষা করিবে? এক পদ কর্ত্তন করিয়া অন্যপদে ভ্রমণের নিস্ফল চেষ্টার ন্যায় আমাদের সকল উন্নতির প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

সমাজের এইরূপ সহস্র দুর্গতির মধ্যে কেবল ভারত-রমণীগণই দেশের ভরসাস্থল। রমণী যদি সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার ও জাত্যাভিমান দূর করিয়া নিজ শিশু সন্তান-দিগকে অভেদ মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, তবে নিশ্চয়ই জাতি বিদ্বেষের ভিত্তিমূল শিথিল হইয়া পড়িবে। শিশু মাতার নিকট যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় পৃথিবীর কোন শিক্ষাই তাহার তুল্য নহে।

সামাজিক কল্যাণের ভিত্তিমূল দৃঢ়তর করিতে হইলে নারীকে সর্ব্বাগ্রে সুশিক্ষিতা করা চাই—জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মে ভূষিতা করা চাই। যেখানে নারীশক্তি নিদ্রিত, সেখানে সমাজ-ব্যাধি শয়তানের মত নানা আকারে আপনার রূপ প্রকাশ করিয়া থাকে এবং তথাকার জাতীয় উন্নতি বালুকার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদের ন্যায় ভূমিসাৎ হয়।

সুশিক্ষিতা ধার্ম্মিকা নারীদ্বারা দেশের কত মঙ্গল সাধিত হইয়াছে, পবিত্রপ্রাণা নারীসকল সমাজের সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কিরূপ ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া স্বদেশে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সুসভ্য জগতে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সমাজের যে স্তরে গুহাস্থিত চৌরের ন্যায় অন্ধকার লুক্কায়িত

রহিয়াছে, নারীশক্তি জ্ঞান ও প্রেমের পবিত্রতা ও সেবার দীপশিখা করে লইয়া সেস্থান আলোকিত করিয়াছে।

আমাদের অতীত ইতিহাস নারীশক্তি এবং নারী-কীর্ত্তিতে পূর্ণ। রমণী সকল দেশেই যুগে যুগে ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার আধার—ভক্তির আদর্শ। পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তিসমা ললনাগণ ভারতের গৃহে গৃহে দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিতা।

কাল্যাণদায়িনী জননীগণ যদি সন্তানগণকে স্বদেশের মঙ্গলমন্ত্রে—প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, তাহাদের সুকুমার প্রাণ কর্ত্তব্য শিক্ষায় সুগঠিত করিতে আরম্ভ করেন,—তাহাদিগকে অভেদব্রতে উদ্বোধিত করিয়া তোলেন, তবে তাহারা নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ জীবনে আপনা-দের দেশকে শত শত কুসংস্কার ও জাতিবিদ্বেষরূপ আবর্জ্জনার হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যত্নশীল হইবে। শক্তিরূপিণী নারীগণ সকলেই এই ব্রত গ্রহণ করুন।

আলোক

আলোক! তুমি নিখিলের আনন্দ, অনন্তলীলাপূর্ণ, বৈচিত্রপূর্ণ, জীবলোকের পরমসম্পদ,—বিশ্বজগতের প্রাণ। এই মর্ত্ত্যলোকে কে তোমায় আনিল বল দেখি? নিয়তি-সূত্রে ভ্রাম্যমান, বিচিত্র কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলাবদ্ধ বিরাট বিশ্বযন্ত্রে আনন্দরূপে কে তোমায় ঢালিয়া দিল, বল দেখি? যখন তুমি ভুবনমোহিনী ঊষার রত্নকিরীট বিভূষিত করিয়া অনন্ত সীমাশূন্য অতলস্পর্শ অন্ধকার পারাবার ভেদ করিয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হও, তোমার স্বর্ণ-কিরণছটায় বসুন্ধরা রঞ্জিত হইয়া উঠে। শুভ্র অঞ্চলে কাঞ্চন ঢালিয়া দিয়া ঊষাদেবী যখন জীবের দ্বারে সমাগত হন, তাঁহার মধুর হাস্যরাশি চরাচর-বক্ষে উছলিয়া পড়ে সেই শুভমুহূর্ত্তে তোমার অমৃতস্পর্শে নিতান্ত নিরাশ প্রাণেও কি আশার সঞ্চার হয় না? নিতান্ত দুঃখতপ্তহৃদয়েও কি আনন্দের একটি রেখা অঙ্কিত হয় না? তোমার নিকট ধনী দীন পাপী সাধুর ভেদ নাই। যে ব্যক্তি জগৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত—ঘৃণিত, পদদলিত, তোমার স্নেহবাহু তাহার জন্যও প্রসারিত। এমন সাম্যনীতি মানবের কোথায়?

দ্যুলোক ও ভূলোকের বরণীয়, আলোক-শিশুর প্রথম

জন্ম, স্থিতি এবং অনন্তরূপে বিকাশ সম্বন্ধে নানাদেশে নানাপ্রকার অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ গল্প রচিত হইয়াছে। ভারতের পুরাণ ইতিহাসেও এই প্রকার অদ্ভুত চলিত গল্পের অভাব নাই। গল্প ও রূপকের মনোহর আবরণে সত্যের উজ্জ্বলদেহ আচ্ছাদন করা সকলদেশেরই অতীত ইতিহাস-লেখক—বর্ত্তমান জনসমাজের পূর্ব্বপুরুষগণের—আমোদের বিষয় ছিল। সেই রূপকের আবরণ ভেদ করিয়া শুদ্ধ সত্যকে জনসমাজে প্রকাশিত করা মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষেও নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান যুগের জ্যোতিষিগণ কল্পনার আশ্রয় ছাড়িয়া দিয়া বিজ্ঞানের সাহায্যে আলোক সম্বন্ধে যতটুকু সত্য লাভ করিয়াছেন তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা এখানে করিব।

সূর্য্যের আলোক-রশ্মি সহস্রভাগে বিভক্ত হইয়া ধরারাণীর নয়নগোচর হয়। ঐ রশ্মিসমূহ কিরণ বা অংশুনামে অভিহিত হইয়া থাকে। এ নিমিত্তই সূর্য্যের নাম সহস্র-রশ্মি বা সহস্রাংশু। মানবের দেহরক্ষার উপযোগী যতপ্রকার বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে সূর্য্যালোকের উপকারিতা অসামান্য। সূর্য্যালোক ভিন্ন ভূমণ্ডলে আরও বহুবিধ আলোক দৃষ্ট হয়; যথা নক্ষত্রা-

লোক, চন্দ্রালোক, তড়িতালোক, অগ্নি দ্বারা সমুৎপন্ন আলোক ইত্যাদি। উজ্জ্বল মণিসমূহ হইতে একপ্রকার আলোক নির্গত হইতে দেখা যায়। জোনাকীপোকা এবং সমুদ্রজাত কোন কোন প্রাণী হইতে একপ্রকার আলোক নিঃসৃত হয়। বিস্তৃত জলাভূমিতে, প্রান্তর মধ্যে গলিত-প্রায় কোন কোন উদ্ভিদের দেহ হইতে নিশাকালে যে এক প্রকার বাষ্প বাহির হয়, তাহাতে আমরা আলোক দেখিতে পাই। তাহা প্রকৃত আলোক না হইলেও আলোক নামেই খ্যাত।

নিবিড় বনানীসম্ভূত দাবাগ্নির বহুদূরব্যাপী দীপ্ত আলোকরশ্মিতে এবং আগ্নেয়গিরি-উদ্ভূত আলোকের কিরণছটায় অনেক দেশ দীপ্তিময় হইয়া থাকে। নীলাম্বুনিধির বিশালবক্ষেও স্থানে স্থানে বাড়বাগ্নি নামক এক প্রকার আলোকের উদ্ভব দর্শন করিয়া সাগরতীর-বাসী এবং পোতারোহী মানবগণ ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হন।

মানবের দৃষ্টিশক্তির অগোচর সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর যে ইথর-তরঙ্গ মহান্ ব্যোম ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে, আমাদের অধিষ্ঠানভূতা বিশাল পৃথিবী অনাদিকালে একদিন যে ইথররূপী পরমাণুপুঞ্জে বর্ত্তমান ছিল, আলোক

সেই ইথর-তরঙ্গের শক্তিরই অংশ মাত্র। ইথর-তরঙ্গের এই মঙ্গলময় খেলা আলোকরূপে লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়া থাকে। পরমাণুপুঞ্জের স্পন্দন হেতুই যে আলোকের সৃষ্টি তাহা বিজ্ঞান অনেক দিন হইল প্রমাণ করিয়াছে। পরমাণুপুঞ্জের এই স্পন্দন, ঘর্ষণ, ঘাত প্রতিঘাত, বিরাট বিশ্বের সৃষ্টি ও রক্ষণ ব্যাপারে কি প্রকার কার্য্যকারিতা প্রদর্শন করিতেছে, যুগের পর যুগ, দিনের পর দিন ভৌতিকজগতে কি প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত করিতেছে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে জ্যোতির্বিদগণ সর্ব্বদাই আপনাদের অসামান্য ধীশক্তি এবং সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। নিউটন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ আলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেকগুলি সত্য জনসমাজে প্রচার করিয়া বাস্তবিকই জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। সূক্ষ্ম হইতেই স্থূলের সৃষ্টি। যাহা চক্ষুর অগোচর, দূরবীক্ষণ যন্ত্রেরও অগোচর সেই সূক্ষ্মতত্ত্বের গবেষণা বিশেষ দুরূহ ও আয়াসসাধ্য সন্দেহ নাই। ইথর-তরঙ্গের শক্তি, জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি মনীষিগণ অন্ধশক্তির কার্য্য বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই? নানা ভাবপূর্ণ, লীলাপূর্ণ, সৌন্দর্য্যপূর্ণ, সুনিয়ম ও শৃঙ্খলাবদ্ধ বিরাট বিশ্বরাজ্যের সৃষ্টি, স্থিতি,

প্রলয়কার্য্য শুধু কি অন্ধশক্তির ক্রিয়া? ইহাতে কি কোন চৈতন্যময়, মঙ্গলময় শক্তি কার্য্য করিতেছে না? সত্য সত্যই সাধকগণ প্রতি পরমাণুতে এক মহান্ চৈতন্যময় জ্ঞানময় শক্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন।

মহাকায় সূর্য্যমণ্ডলের ভীষণ অগ্নিময়দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়া আলোক গ্রহ, উপগ্রহ সকলের জবনীশক্তি বিধান করিতেছে এবং নানা প্রকারে তাহাদের অশেষ কল্যাণসাধন করিতেছে। মার্ত্তণ্ডমণ্ডল হইতে আলোকমালা প্রতি সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল ধাবিত হইয়া ৮ মিনিট ১৮ সেকেণ্ড সময়ে ধরণীরাজ্যে পঁহুছিয়া থাকে।

আপনার ভীষণ-দর্শন দেহস্থিত প্রচণ্ড প্রলয়রূপী অগ্নিরাশিতে অহর্নিশি দগ্ধীভূত হইয়া অংশুমালী সূর্য্য অবিরত সৌরজগতে আলোক বিকীরণ করিতেছেন। জ্যোতিষিগণ সেই প্রলয়রূপী সূর্য্যকিরণের উত্তাপ সম্বন্ধে গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে সূর্য্যের তাপের পরিমাণ ছয় হাজার (৬০০০) ডিগ্রিরও অধিক! কেহ কেহ বা ঠিক ছয় হাজার ডিগ্রি বলিয়াই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ভূমণ্ডল হইতে লক্ষ লক্ষ গুণ বৃহত্তর, প্রকাণ্ডকায়, মার্ত্তণ্ডদেব অনেকগুলি গ্রহ উপগ্রহে পরিবৃত হইয়া অবিশ্রান্ত

ছুটিতেছেন ; আপনার কক্ষপথে আবর্ত্তন করিতে করিতে ভীমবেগে (সেই ভ্রমণবেগ এক সেকেণ্ডে প্রায় ত্রয়োদশ মাইল) অভিজিৎ নামক মহালোক লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইতেছেন।

রবিমণ্ডলের ভ্রমণবেগের সহিত আলোকরাশি গ্রহ উপগ্রহে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। প্রতিদিন যে পরিমাণ আলোকরশ্মি অবিশ্রান্ত সৌরজগতে বিতরিত হইতেছে তাহার অতি সামান্য অংশই বসুধাবাসী জীবগণ লাভ করিয়া থাকেন। সূর্য্য কতকাল এই আলোক বিতরণ-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, আর কত কালই বা থাকিবেন তাহা মানব-বুদ্ধির অতীত।

নীল, পীত, লোহিত, হরিত, অতি পাটল, বেগুণে, গাঢ় ধূমল এই সপ্তবিধ পরম রমণীয় মূল বর্ণ আলোক রশ্মিতে দৃষ্ট হয়। বর্ণ সমূহের রাসায়নিক সংমিশ্রণজন্য সূর্য্যালোককে বর্ণহীন বলিয়া প্রতীতি জন্মে। রাসায়নিক সংমিশ্রণরূপ মহাবিধানে শুধু আলোক-নিহিত বর্ণসমূহ কেন, অনেক বস্তুই সম্পূর্ণ রূপান্তর হইয়া থাকে। বিশ্বের অনন্ত মঙ্গল উদ্দেশ্যে, বিশ্ববিধাতার আদেশে প্রকৃতি এই কার্য্যভার (আলোক বিশ্লেষণ, সংমিশ্রণ কখন বা সম্পূর্ণ রূপান্তর করণ) গ্রহণ করিয়াছেন।

পৃথিবীর নানাস্থানের বৈজ্ঞানিক মনীষিগণ সূর্য্য-কিরণ বিশ্লেষণ কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। রশ্মি বিশ্লেষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাঁহারা অতি সহজেই বর্ণ সকলের পৃথক পৃথক কার্য্যকারিতা দর্শন করিতে পারেন। এই আলোক বিশ্লেষণযন্ত্র মানব-প্রতিভার এক অভাবনীয় কীর্ত্তি। কি অতি দূরস্থিত নভোবিহারী নক্ষত্রপুঞ্জ, কি ছায়াপথবর্ত্তী নক্ষত্র, কি ততোধিক দূরবর্ত্তী ধূমপুঞ্জবৎ নীহারিকা, কি সূর্য্যমণ্ডল এবং অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ সকল, জ্যোতির্বিদগণ রশ্মি-বিশ্লেষণ যন্ত্রের সাহায্যে মর্ত্ত্যলোকে বাস করিয়াও সমস্তই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ও সুস্পষ্টভাবে অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা বর্ণ-পরীক্ষায় যন্ত্রবলে জ্যোতিষ্করাজ্যের নিত্য নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছেন।

ত্রিকোণ বিশিষ্ট কাচখণ্ডের সহায়তায় আমরাও মার্ত্তণ্ড-কিরণের বর্ণসমূহ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অবলোকন করিতে পারি।

সুন্দর নীলাম্বরপ্রান্তে দিগন্ত প্রসারিত রামধনুর উদয় কি মনোরম! তাহাতে পর্য্যায়ক্রমে সপ্তবিধ বর্ণের সমাবেশ কেমন নয়নের তৃপ্তিকর! প্রকৃতিদেবী যেন দিগঙ্গনাকে বিচিত্র বর্ণের রত্নভূষণে বিভূষিতা

করিয়া দেন। বৃষ্টিবিন্দুসমূহে বিপরীতবর্ত্তী সূর্য্যরশ্মি প্রতিবিম্বিত হওয়াতেই রামধনুর উৎপত্তি, ইহা সকলেই অবগত আছেন। কাচখণ্ডের ন্যায় জলবিন্দুরও আলোক বিভাগ করিবার শক্তি আছে; তাহাতেই ঐ সকল বর্ণ স্বতন্ত্ররূপে লোক-নয়নের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। ধরণী-রাজ্যে রবিকিরণ-সম্ভূত এই সপ্তবিধ মূল বর্ণের কি সুন্দর বিশ্লেষণ! বর্ণসমূহের নানারূপ রাসায়নিক সংযোগে প্রকৃতিবক্ষে অশেষপ্রকার নয়নবিনোদন বর্ণের সমুদ্ভব হইয়া থাকে। এই অতি সুন্দর বর্ণ-সন্নিবেশ নিবন্ধন প্রাকৃতিক চিত্রপটের যে দিকে দৃষ্টি-পাত করা যায়, হৃদয় একেবারে মুগ্ধ হইয়া যায়। নানা বর্ণের জলদ-বিমণ্ডিত গগনমণ্ডল, কি শ্যামল শাখা-পত্র-পল্লবে পরিশোভিত বৃক্ষলতা গুল্ম বল্লরী,— কি স্তবকে স্তবকে শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত এবং আরও নানা বর্ণের পুষ্পরাশি,—যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, কি অনুভব করি? যেন শিল্পীর মঙ্গলহস্ত প্রত্যক্ষভাবে এই বর্ণসন্নিবেশ কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। ধন্য সেই অচিন্ত্যশক্তি দেবদেবের রচনা-কৌশল ও শিল্পনৈপুণ্য, সর্ব্বত্র তিনি নানা বর্ণ কেমন আশ্চর্য্যরূপে বিচিত্র করিয়া রাখিয়াছেন—প্রকৃতির ভাণ্ডার কি অপরূপ শোভা

ও মাধুর্য্যের আধার করিয়া দিয়াছেন তাহা চিন্তা করিতেও হৃদয় স্তব্ধ হইয়া যায়। আলোকের বর্ণ-সকল নৈসর্গিক নিয়মে কেমন বিবিধ প্রকারে নানা রঙ্গে প্রকৃতিরাজ্যে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, তাহা ধারণা করা ক্ষুদ্র জীবের সাধ্য নয়।

নীল, পীত, হরিত প্রভৃতি যতপ্রকার বর্ণের অপূর্ব্ব সমাবেশ অবলোকন করা যায়, তন্মধ্যে পরম মনোরম হরিৎই সর্ব্বপ্রধান; ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র হরিৎ বর্ণেরই প্রাধান্য দর্শন করা যায়। পরীক্ষা দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে যে হরিৎবর্ণ স্বাস্থ্যের পক্ষে মহা উপকারী এবং হরিৎ ও নীলবর্ণ দৃষ্টিশক্তি রক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। জীবের কল্যাণের জন্যই পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বর সৃষ্ট পদার্থে হরিৎ ও নীল বর্ণের আধিক্য প্রদান করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

ডাক্তার ফিন্সেন্ প্রভৃতি চিকিৎসাবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত-গণ আলোকচিকিৎসায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া-ছেন। এই অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ রশ্মি-বিশ্লেষণ যন্ত্রের সাহায্যে সূর্য্য-কিরণের বর্ণসমূহ স্বতন্ত্রীভূত করিয়া প্রতীচ্য জগতে চিকিৎসাশাস্ত্রে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। অনেক দুশ্চিকিৎস্য কঠিন ব্যাধি তাঁহারা

আলোকচিকিৎসা দ্বারা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কঠিন ব্যাধিতে শয্যাশায়ী, মৃত্যুর করাল গ্রাসে সমুদ্যত কত অমূল্য জীবন আলোক-চিকিৎসা দ্বারা রক্ষা পাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রখর মার্ত্তণ্ড-রশ্মি-নিহিত নীল, বেগুনে ও হরিত বর্ণ বিবিধ বিষাক্ত বীজ নষ্ট করিবার পক্ষে বিশেষ শক্তিসম্পন্ন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণ আলোক-রশ্মি হইতে আবশ্যক মত বিভিন্ন বর্ণ সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন ব্যাধির চিকিৎসা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, এবং তাহাতে আশ্চর্য্যরূপে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া থাকেন। মানব বিজ্ঞানবলে প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজ আয়ত্তাধীনে নিযুক্ত করিতেছেন। আমেরিকার জল চিকিৎসার বিষয় কাহারও অবিদিত নাই। আলোক-চিকিৎসা তদপেক্ষাও বিস্ময়কর।

ডাক্তার এরিকসিন্, অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক ওমনি প্রভৃতি মনীষিগণ বিজ্ঞানের অদ্ভুত গবেষণাবলে আলোকের কি প্রকার কার্য্যকারিতা মানব সমাজে প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা চিন্তা করিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে পাথুরিয়া কয়লা দ্বারা উৎপন্ন তাপে যেপ্রকার যন্ত্রাদি পরিচালিত হইয়া থাকে, প্রখর মার্ত্তণ্ড-কর সংগৃহীত হইলেও সেই প্রকার

কার্য্য হইতে পারে; যন্ত্রসাহায্যে সূর্য্যকিরণ সংগ্রহ করিয়া অনায়াসেই পোত প্রভৃতি পরিচালিত করিতে পারা যায়। তাঁহারা অলৌকিক প্রতিভাবলে কয়েকটি সূর্য্যকর-চালিত যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া নিঃসংশয়ে জনসমাজে এই তথ্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, কয়েক গজ পরিমিত স্থানের রবিকর একত্র করিলে সেই শক্তিনিয়োগে একখানা অর্ণবযান অনায়াসেই পরিচালিত হইতে পারে। সমগ্র পৃথিবীতে তরণী, বাষ্পীয়যান ও অন্যান্য কল কারখানায় প্রায় আশী কোটি টন (প্রত্যেক টন প্রায় ২৭ মন) কয়লা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সাহারা মরুতে যেপরিমাণ সূর্য্যরশ্মি এক বৎসরে ব্যয়িত হয় তাহা সংগৃহীত হইলে সেই শক্তি, পূর্ব্বোক্ত কয়লারাশির সমতুল্য কার্য্যকর হইবে।

অনেকে আশঙ্কা করেন, পৃথিবীর কয়লারাশি যেপ্রকার দ্রুত ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে, তাহা ভবিষ্যতে যুগ যুগান্তর পরে এককালে নিঃশেষ হইবার সম্ভাবনা। কতকালে সমস্ত কয়লারাশি সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইবে পণ্ডিতগণ তাহার গণনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। তখন পৃথিবীর সভ্যজগতের দশা কি হইবে? বাণিজ্য প্রভৃতি

কি একেবারে লোপ হইয়া যাইবে ? এই চিন্তায় অনেকে এখনই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু গ্রহ-রাজ সূর্য্য আলোকদানে কখনই কৃপন নহেন। বিজ্ঞান যেপ্রকার অপ্রতিহত প্রভাবে পৃথিবীতে দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে, তাহাতে কয়লার অভাব সূর্য্যালোকেই পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই।

বৃক্ষলতা, গুল্ম ও শস্য প্রভৃতির জীবনী শক্তি বিধান সম্বন্ধে সূর্য্যালোকের কার্য্য প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায়। যে শস্য দ্বারা বিশ্বব্যাপী জীবগণের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে, যে শস্যপুঞ্জ সংসারে সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ও সুখ সমৃদ্ধির মূলীভূত, সূর্য্যালোকই তাহার প্রাণ-স্বরূপ।

পানীয় জলের উপর সূর্য্যালোকের ক্রিয়া আশ্চর্য্য-জনক। সূর্য্যালোক নানারূপ জীবাণু ধ্বংস করিয়া জল বিশুদ্ধ করে। বিবিধ প্রকার বর্ণের কাচপাত্রে পানীয় জল রাখিয়া সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত করিলে বিভিন্ন শ্রেণীর রোগ আরাম হইয়া থাকে ; ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। আর্দ্র স্থান শুষ্ক করিয়া ম্যালেরিয়াবিষ নষ্ট করিতে সূর্য্যা-লোকের শক্তি অসাধারণ।

সূর্য্যকিরণ দ্বারা চন্দ্র আলোকিত হয়, তাহাতেই

আমরা হৃদয় মনের আনন্দকর এমন শোভাময় চন্দ্রিকা সম্পদের অধিকারী, এ কথা কাহার অবিদিত? সর্ব্ব-প্রকার আলোকের মূল সবিতা। যিনি সবিতার সৃষ্টি-কর্ত্তা তাঁহাকে শত সহস্র নমস্কার।

শ্রেষ্ঠ শিক্ষালয়

অমরেন্দ্রনাথ অতি মনোযোগের সহিত প্রফুল্লকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

অমরেন্দ্র যখন পড়াইতেন সেই বালিকাহৃদয়ে কি এক আনন্দ ধারা তাহার অজ্ঞাতসারে প্রবাহিত হইত। কোন্ দিক্ হইতে ইহা বহিয়া যাইত, সে তাহা নিজেই বুঝিতে সমর্থ হইত না।

একদিন অমরেন্দ্র প্রফুল্লকে জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা বুঝাইতেছেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"প্রফুল্ল, এই একটা বৃত্ত; ইহার মধ্যবিন্দু হইতে কয়েকটি সরলরেখা টানিয়া লও। ইহারা পরস্পর সমান। 'যে যে বস্তু কোন এক বস্তুর সমান, তাহারা পরস্পর সমান।' এখন ভাল করিয়া বুঝাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি প্রতিজ্ঞাটি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া কহিলেন—

"শোন প্রফুল্ল! এই প্রকার মানবজীবনের সমস্ত কার্য্যের মধ্যবিন্দু ভক্তি। আমরা যতগুলি কার্য্য করিয়া যাই, সেই ভক্তিকে স্পর্শ করিয়া কার্য্য যে-দিকেই বিস্তৃত হইয়া পড়ুক না কেন, জ্যামিতির পূর্ব্বোক্ত সরল-রেখার ন্যায় তাহাদের কখনও অসামঞ্জস্য হইবে না।

তাঁহার ছাত্রীটি এই সমস্ত কথা বুঝিতে পারিতেছে কিনা সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই। মানুষ যখন প্রকৃত জনহিতৈষণা-প্রণোদিত প্রেম ও হৃদয়াবেগ দ্বারা চালিত হয়, তখন সেই দেশ-সেবকের এ প্রকার দৃষ্টি অনেক সময়ই থাকে না। তাঁহার কথা লোকে সম্যক না বুঝিলেও তাহাতে অনেক কার্য্য হয়।

প্রফুল্ল,—"ভক্তি কি ?"

অমরেন্দ্র,—"হৃদয়ের যে গভীর অহেতুক অনুরাগ তাহার নাম ভক্তি। প্রেম ভক্তিরই নামান্তর। আপনার পিতামাতা প্রভৃতিতে ভালবাসা ভক্তির প্রথম শিক্ষা; তারপর স্বদেশ। ভক্তি যখন আত্মীয়-স্বজন, স্বদেশ ছাড়াইয়া উচ্ছ্বসিতা কুলপ্লাবিনী তটিনীর ন্যায় অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া পড়ে, তখনই তাহার পরিপূর্ণতা সম্পাদিত হয়। তখনই বিশ্বমোহিনী ভক্তির পূর্ণ বিকাশ ও তাহার সাফল্য লাভ হইয়া থাকে। ইহারই নাম্ সার্ব্বভৌমিক প্রেম। ইহা ভিন্ন জীবনের সার্থকতা কোথায়? যেমন জ্ঞানার্জ্জনের পূর্ব্বে বর্ণমালা শিক্ষার আবশ্যক সেই প্রকার বিশ্বজনীন প্রীতিলাভ করিতে হইলে, প্রথমে পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন এবং স্বদেশকে ভালবাসা চাই।"

প্রফুল্ল সকল কথা ভাল করিয়া না বুঝিলেও, যেটুকু বুঝিতেছে তাহাই তাহার হৃদয়ে তীরের মত বিদ্ধ হইতেছে। সে কহিল—

"কেমন করিয়া ভক্তি লাভ হয় বুঝাইয়া বলুন।"

অমরেন্দ্র,—"শিশুর যে মায়ের প্রতি অনুরাগ তাহা কেমন করিয়া হয়? উহা স্বভাব হইতেই জন্মে। প্রথম হইতেই সে 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিতে শিখে। মায়ের কোলে যাইয়া সকল ব্যথা ভুলিয়া যাইতে হইবে, ইহা শিশুকে কে শিখাইয়া দেয়? বিশ্বজননী অনন্ত প্রেমের প্রস্রবণ। তাঁহার অর্চ্চনা করিলে ভক্তি বিকশিত হয়। যিনি হিন্দুর মন্দিরে আদ্যাশক্তি রূপে পূজিতা, সকল দেশে, সকল সম্প্রদায়ে তাঁহারই অর্চ্চনা হইতেছে। সেই প্রেমের অমৃত ধারার নিকট সকল দেশ, সকলজাতি, সকল বর্ণ, তুল্য। এখানে কি মধুর সম্মিলন? প্রথমে ভক্তিভাবে স্বদেশের কল্যাণকর কার্য্যে ব্রতী হওয়া চাই।"

প্রফুল্ল,—"স্ত্রীলোকেরা কি দেশের কাজ করিতে পারে না?"

অমরেন্দ্র,—"পূর্ব্বেই তো নারীশক্তি জাগ্রত হওয়ার আবশ্যক। ভক্তিতেই শক্তিলাভ হয়। নারীশক্তি

জাগিয়া না উঠিলে শক্তির বিকাশ অসম্ভব। এই শক্তির বিকাশ হইতেই দেশ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে।"

প্রফুল্ল—"নারীশক্তি জাগিয়া উঠিবার উপায় কি বিশেষ করিয়া বলুন।"

অমরেন্দ্র,— "হৃদয়মধ্যে ভক্তি লাভ করিবার যেসকল অন্তরায় আছে নারীগণ তাহা প্রথমে দূর করুন। বীজ হইতে বৃক্ষ আপনি জন্মে, আপনিই তাহাতে ফল প্রসূত হয়। এ কার্য্যভার প্রকৃতিই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কৃষক যদি সে অঙ্কুরোদ্গমের স্থানটি প্রস্তরদ্বারা চাপিয়া রাখে তবে প্রকৃতির কার্য্য বন্ধ হয়।

প্রফুল্ল,—"বুঝিলাম না।"

অমরেন্দ্র,—"বাহিরে যেমন প্রকৃতির কার্য্য ভিতরেও ঠিক তেমন। নারীগণ যদি আপনার প্রাণকে ঠিক স্বাভাবিকতায় প্রতিষ্ঠিত রাখেন, অর্থাৎ নানাপ্রকার হিংসা, বিদ্বেষ, বৃথা কলহ প্রভৃতি আবর্জ্জনা হৃদয় হইতে দূর করিয়া দেন, তাহা হইলে প্রকৃতির প্রসাদে প্রীতি প্রভৃতি সদ্গুণ সকল আপনি বিকশিত হইয়া উঠিবে। তাহাদের সন্তানগণও নানা সৎশিক্ষায় সুশিক্ষিত হইতে থাকিবে।"

প্রফুল্ল—"একথাটি আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলুন।"

অমরেন্দ্র—"সন্তানগণ বড় হইলে যে তাহার শিক্ষা আরম্ভ হয়, এমন নহে। শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন হইতে তাহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। অনেকে মনে করেন যে শিশুরা কিছুই বোঝে না। কিন্তু শিশুর ধারণাশক্তি অতিশয় প্রবল। সেই কোমল প্রাণে যেশিক্ষা প্রবিষ্ট হয়, তাহা একেবারে বদ্ধমূল হইয়া যায়। এজন্য মাতৃগণের কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। নারীজাতির কর্ত্তব্য যে কেবল ঘরকন্নায় আবদ্ধ থাকিবে, এমন হইতে পারে না। সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য, দেশের প্রতি কর্ত্তব্য, এই প্রকার অনেক কর্ত্তব্য আছে। মাতা যদি সকলদিক্ দিয়া কর্ত্তব্য পরায়ণতা লাভ করেন, তাহা হইলে সন্তানগণ বাল্যকাল হইতে এমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় দীক্ষিত হইয়া উঠিবে যে, তাহারা জীবনের কোন সময়েই সেই কর্ত্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। সংসর্গ, শিক্ষা ও মাতৃস্তন্য প্রকৃতিকে কিপ্রকার পরিবর্ত্তিত করে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

"একবার এক বাঘিনী একটী নবজাত মনুষ্য-শিশু হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল,"—

নরেন কিঞ্চিৎ দূরে বসিয়া অঙ্ক কষিতেছিল। সে এই বাঘের গল্প শুনিয়া শ্লেট পেন্সিল ফেলিয়া অমরেন্দ্রের

কাছে আসিয়া বসিল। নিতান্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—

"দাদা! তারপর?"

অমরেন্দ্র,—"তারপর সেই শিশুটিকে বাঘিনী আপন স্তন্য দিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিল। বাঘিনী-মাতা ও তাহার শিশুগণের সহিত সে মনুষ্যবালক একত্রে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বালকটি ৬।৭ বৎসর পরে এক অরণ্যে বাঘিনী-মাতার আশ্রয় হইতে মনুষ্যের হস্তগত হইল।"

নরেন,—"তারপর উহাকে কি করিল?"

অমরেন্দ্র,—"প্রথম উহাকে একটা প্রাচীর দেওয়া বাগানে খোলা-ই রাখা হইয়াছিল। বাঘ যেমন শিকার ধরিয়া থাকে সেও সেইরূপ শিকার ধরিবার চেষ্টা করিত। একদিন সে অন্য একটি বালককে সেইভাবে হঠাৎ আক্রমণ করিল। তাহার পর হইতে উহাকে শিকল দিয়া রাখা হইত। তাহার ঠিক্ বাঘের প্রকৃতিলাভ হইয়াছিল; —সেই প্রকার তেজ, সেই প্রকার চলাফিরা আহার ও খেলা, সেইপ্রকার থাবা মারিয়া ধরা। এখন দেখ, শিক্ষা ও মাতৃস্তন্য মানুষের প্রাণে কত কার্য্য করিয়া থাকে।"

নরেন ব্যস্ত হইয়া কহিল—"দাদা, তারপর সে ছেলেটির কি হইল?"

অমরেন্দ্র—"তারপর সেই ছেলেটির প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করা হইল। মনুষ্যের মত তাহার খাদ্যের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইল। অর্থাৎ ভাত এবং মাংস রাঁধিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু সে খাদ্য উহার সহ্য হইল না, শীঘ্রই সে পেটের পীড়ায় মারা গেল।"

অমরেন্দ্র বলিতে লাগিলেন—"শোন প্রফুল্ল! মনুষ্য এইপ্রকার বাঘের প্রকৃতি কোথা হইতে পাইল? ইহার একমাত্র উত্তর—মাতৃস্তন্য ও শিক্ষা হইতে। মন্দদিকে যেমন, ভালদিকেও সেইপ্রকার শিক্ষিত হইতে পারে। মাতৃস্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে যেশিক্ষা মাতার নিকট হইতে মানবগণ লাভ করিয়া থাকে, তাহার শক্তি অসামান্য। আমাদের জননীগণ যদি ভক্তিতে উদ্বোধিতা হইয়া উঠেন, আমরা সে মহাউদ্বোধন মাতার নিকট হইতে লাভ করিব। আমাদের মাতৃগণের হৃদয় যদি প্রেম ভক্তিতে পূর্ণ হয়, তবে আমরা কেন না প্রেমিক ও ভক্ত হইব? ভারতের অর্দ্ধেক এই নারী-শক্তি। নারী-শক্তি চেতনা লাভ করুক, তবেই দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে। মাতৃক্রোড়ই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষালয়।" *

* লেখিকার "অমরেন্দ্র" নামক উপন্যাস হইতে।

সূর্য্য-মণ্ডল

সুদূর নভোমণ্ডলে তেজোময় অগ্নিময় মূর্ত্তি! কি মহিমাপূর্ণ মাধুরী! যুগে যুগে এই ভূমণ্ডলে কত পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল—কত বিপ্লব এবং বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া সভ্যতা ও বিজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে মানবসমাজ উন্নতির উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিল কিন্তু ঐ অগ্নিময় মূর্ত্তি আকাশে একই ভাব সমুদিত। এমন অলৌকিক গাম্ভীর্য্যময়ী সুষমার নিকট কাহার হৃদয় না প্রীতিভরে নত হয়? এই মহিমাময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া একদিন আর্য্যঋষি হিমানিমণ্ডিত গিরিকন্দর এবং নির্ম্মলসলিলা তটিনী প্রতিধ্বনিত করিয়া মধুর গম্ভীর কণ্ঠে গাইয়াছিলেন :—

হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্ন পাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ১৫ ॥

ঈশোপনিষৎ।

'হে জগতের পোষক সূর্য্য! তোমার জ্যোতির্ম্ময় পাত্র দ্বারা সত্যের (অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডল স্থিত ব্রহ্মের) মুখ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। সত্যধর্ম্মানুষ্ঠায়ীর দৃষ্টির জন্য তাহা আবরণশূন্য কর।"

ভারতের সুবর্ণযুগে জগতের বরণীয় যে আর্য্যজাতি —ভারতমাতার সুসন্তানগণ, প্রকৃতির প্রতি বস্তুতে ব্রহ্মসত্তা অবলোকন করিতেন; জলে, স্থলে, আকাশে, বৃক্ষ, লতায়, অগ্নিশিখাতে ভূমা মহেশ্বরের পরম জ্যোতি দর্শন করিয়া—সেই দেবদেবের অর্চ্চনা করিয়া কৃতার্থ হইতেন, তাঁহারা অশেষ শক্তির আধার সূর্য্যমণ্ডলে সত্যস্বরূপ পরমাত্মার উজ্জ্বল সত্তা কেন না প্রত্যক্ষ করিবেন?

বস্তুতঃ আনন্দদায়িনী ঊষার অঙ্কে নবোদিত রবির ভুবনমোহিনী ছবি কি সুন্দর! নীলিমাময় অনন্ত আকাশে শয়ান রক্তমূর্ত্তি দেবশিশুর মত তরুণ তপন যখন আলোক-রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া হাসিতে থাকে তখনকার শোভা সন্দর্শন করিয়া কাহার প্রাণ না নির্ম্মল আনন্দে,—পবিত্র ভগবদ্ভক্তিতে উছলিয়া ওঠে? প্রভাতের শুভ সমাগমে এক অজ্ঞাত, অভাবনীয় মঙ্গল আহ্বান-ধ্বনিতে নিতান্ত মোহসুপ্ত হৃদয়ও কি জাগরিত হয় না!

আবার যখন দেখিতে দেখিতে সেই সহস্রাংশু প্রচণ্ড মূর্ত্তিতে মধ্যাহ্ন গগনে উদিত হইয়া ধরাতলকে সন্তাপিত করিতে থাকে, মানবগণ নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ, কোলাহলময়

কর্ম্মক্ষেত্রের নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, তখন সেই মহাশক্তিশালী সূর্য্যকান্তিতে শক্তিদাতা পরম দেবের অনন্ত শক্তি কিঞ্চিৎ অনুভব করিয়া কাহার হৃদয় না কৃতজ্ঞতা রসে পূর্ণ হয় ?

সারাদিন আলোক বিতরণ করিয়া সন্ধ্যাকালে সেই দিনমণি যখন অস্তগমনের উদ্যোগ করে,—যখন হেম-কিরীট বিভূষিতা সন্ধ্যা শ্রান্ত ক্লান্ত জীবগণের বিশ্রামের আয়োজনে প্রবৃত্ত থাকে, সেই সময় অস্তগামী রবির শান্ত শোভাময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কোন্ ভাবুকের প্রাণ না মহাভাবে নিমগ্ন হয়, এবং সেই পরম আশ্রয়দাতার চরণে আপনা আপনি শরণাপন্ন হইয়া পড়ে ?

সূর্য্যমণ্ডলই বিশ্বের প্রাণ এবং সকল শক্তির আধার। ভূমণ্ডলে শক্তির যে কি বিকাশ দেখিতে পাইতেছি সূর্য্য হইতেই তাহার অধিকাংশ গৃহীত হইয়াছে। মানব সভ্যতার শৈশবাবস্থায় এই সূর্য্য সম্বন্ধেও নানা দেশে কত চিত্তরঞ্জন আমোদজনক গল্প কল্পিত হইয়াছিল এবং অদ্যাপি অশিক্ষিত সমাজে কত অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু যুগের পর যুগ বিজ্ঞানের প্রখর উজ্জ্বল আলোক যেরূপ অপূর্ব্ব প্রভায় সমস্ত

সুসভ্য দেশে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে. তাহাতে ধূম ছায়া স্বতঃই লোকের হৃদয়ক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইযা যাইতেছে।

আকাশের অনন্ত নক্ষত্র-পুঞ্জের মধ্যে আমাদের জীবনস্বরূপ সূর্য্যও যে একটি নক্ষত্র মাত্র, বিজ্ঞান তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছে। বিশ্ববিধাতার এই বিরাট রহস্যময় বিশ্বযন্ত্রে অগণ্য নক্ষত্ররাজির ইয়ত্তা কে করিবে? তাহাদের বর্ণ বৈচিত্রই বা কত মনোহর! সূর্য্য তাহাদেরই একটী ভিন্ন আর কিছুই নহে। সূর্য্য-মণ্ডলের আকৃতি, ধাতব সন্নিবেশ, বিভিন্ন অবস্থা, গতি প্রভৃতি আলোচনা করিতে ডাক্তার ষ্ট্রুবন্ জেনসন প্রভৃতি মনীষিগণ যেপ্রকার গবেষণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা নিতান্তই আশ্চর্য্যজনক। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে জ্যোতিষ্কতত্ত্বের আলোচনায় অনেক ললনারত্ন পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছেন। মার্কিন নারী মিসেস ফ্রেমিং এবং মিস ক্যানেনের বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। যদিও তাঁহারা বিদেশীয়া, আমাদের মাতৃভূমি হইতে শত শত ক্রোশ দূরে অবস্থিত তথাপি এই সমস্ত মহিলা সমগ্র নারীজাতির গৌরবস্বরূপ সন্দেহ নাই। প্রতীচ্যদেশে এবং প্রাচ্য জগতেও

এরূপ অনেক মহিলা আছেন, যাঁহাদের প্রতিভা স্মরণ করিয়া প্রাণ এক সার্ব্বভৌমিক আনন্দে পরিপ্লুত হয়। এস্থলে খনা, লীলাবতী প্রভৃতি ভারতের অতীত কালের বিদুষী নারীগণ স্মৃতিপথে উদিত হইতেছেন।

ভূমণ্ডল হইতে সূর্য্যের দূরত্ব সামান্য নহে। এই দূরত্ব সম্বন্ধে জ্যোতির্বিদগণের মধ্যে কিঞ্চিৎ মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন সূর্য্য ও পৃথিবীর ব্যবধানপথ নয় কোটি বিশ লক্ষ মাইল (৯২০০০০০০)। কেহ বলেন, নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল (৯৩০০০০০০), কেহ কেহ বা নয় কোটি তেত্রিশ লক্ষ মাইল বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যদিও নক্ষত্রপুঞ্জের তুলনায় সূর্য্যমণ্ডল দূরত্বে অনেক ন্যূন, তথাপি সূর্য্য সম্বন্ধে কোন বিষয় স্থির সিদ্ধান্ত করা সহজসাধ্য নয়।

সূর্য্যের ব্যাস প্রায় আট লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার তিন শত আশি মাইল (৮৫৩৩৮০), পরিধি প্রায় আটাইশ লক্ষ মাইল (২৮০০০০০)। পৃথিবী হইতে রবি প্রায় তের লক্ষ বত্রিশ হাজার (১৩৩২০০০) গুণ বড়। অর্থাৎ সূর্য্য প্রায় তের লক্ষ বত্রিশ হাজার পৃথিবীর সমান। কিন্তু ইহার ওজন ভূমণ্ডল হইতে মাত্র তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার গুণ বেশী। যদি তুলা দণ্ডে পরিমাণ করা যায় তবে রবি ওজনে

তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার পৃথিবীর তুল্য হইবে। রবি-দেহের তারল্যই বোধ হয় তাহার ভারের অল্পতার কারণ।

পৃথিবীর ব্যাস (৪০০০) চারি হাজার মাইল, চন্দ্রের ব্যাস (১৫৮০) এক হাজার পাঁচ শত আশি ক্রোশ। কিন্তু পৃথিবীর ভার চন্দ্র অপেক্ষা ৭৮ গুণ বেশী। অর্থাৎ পৃথিবী ওজনে ৭৮টি চন্দ্রের সমান। এই হিসাবে সূর্য্যমণ্ডলের ভার অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প সন্দেহ নাই।

ধন্য বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ! বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ বলেই মর্ত্ত্যবাসী ক্ষুদ্র মনুষ্যগণ সুন্দর ব্যোমবিহারী জ্যোতিষ্কমণ্ডল ওজন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আলোক নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ইথরপুঞ্জের স্পন্দন হইতেই আলোকের উৎপত্তি। আলোক বিরাট বিশ্বব্যাপী ইথর-তরঙ্গের খেলা মাত্র। সূর্য্য এবং নক্ষত্রপুঞ্জ সেই আলোকরাশিরই উদ্ভবস্থান—তেজোরাশির বিশাল ঘনীভূত সমষ্টি মাত্র; মহা আকর্ষণে মহাশূন্যে অবস্থিত,—বিঘূর্ণিত এবং প্রধাবিত। মহাত্মা নিউটন, আকর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া জগতের বরণীয় হইয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞান সেই আকর্ষণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে কত প্রয়োজনীয় তথ্যই আবিষ্কার করিতেছেন

তাহা এই প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত-গণ স্থির করিয়াছেন যে সূর্য্যমণ্ডল পৃথিবীর ন্যায় কঠিন পদার্থ নহে, জলের ন্যায় তরলও নহে, অল্প গাঢ়তা বিশিষ্ট। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, প্রভৃতি নানাবিধ দ্রবীভূত ধাতুময় পদার্থ দ্বারা ইহার প্রচণ্ড তাপবিশিষ্ট অঙ্গ গঠিত। বর্ণ বিশ্লেষযন্ত্রের সাহায্যে সুন্দর ব্যোমস্থিত মহান ভাস্কর-দেহের অনেক তত্ত্বই ক্ষুদ্র মানব-বুদ্ধির গোচরীভূত হইতেছে। এমন কোন কোন ধাতু সূর্য্য-কলেবরে আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা পৃথিবীতে দৃষ্ট হয় না।

সূর্য্যকে দূর হইতে রক্তবর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়; এজন্যই আর্য্য কবিগণ তাহাকে জবাকুসুম সঙ্কাশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূর্য্য-দেহের বর্ণ রক্তিম নহে, তাহা কৃষ্ণকান্তি বলিয়াই নির্ণীত হইয়াছে। উজ্জ্বল রশ্মিমালার জন্য কৃষ্ণবর্ণ সূর্য্যদেবকে লোহিতাঙ্গ বলিয়া ভ্রম জন্মে। রবির অঙ্গের প্রত্যেক বিন্দু হইতে সপ্তবিধ বর্ণ সমন্বিত প্রখর রশ্মিমালা উদ্ভূত হইয়া থাকে।

মার্ত্তণ্ড অঙ্গে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্কচিহ্ন ধরা-বাসীর নয়নগোচর হয়। কখন কখন বা তাহা পরিবর্ত্তিত দৃষ্ট হইয়া থাকে। চন্দ্রকান্তিতে যেসকল কলঙ্কচিহ্ন দর্শন করা যায় সৌরকলঙ্ক সেই প্রকার নহে। চন্দ্র

পৃথিবী হইতে মাত্র (২৪০০০০) দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। সুতরাং যত সহজে চন্দ্র-দেহের তত্ত্ব সকল অবগত হওয়া যায়, বহু কোটি মাইল দূরবর্ত্তী সূর্য্যমণ্ডলের তত্ত্ব অবগত হওয়া তত সহজ নহে। তবে কঠিন হইলেও বিজ্ঞানের দূরদর্শী সূক্ষ্ম দৃষ্টির নিকট কিছুই অবিদিত নাই।

দুই প্রকারে সূর্য্যের অঙ্গে কলঙ্ক-চিহ্ন উদ্ভূত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ সূর্য্যাভ্যন্তরবর্ত্তী জ্বলন্ত ধাতব পদার্থের উৎক্ষেপন দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ সূর্য্যমণ্ডলে নৈসর্গিক ঝঞ্ঝাবাত দ্বারা।

তালের রস অগ্নিতে জ্বাল দিতে দিতে ক্রমে যখন উহা ঘনীভূত হইতে আরম্ভ করে, তখন সজোরে ফুটিতে থাকে। যেমন তাহা ফুটিয়া বেগে উৎক্ষিপ্ত হয় তেমনই সূর্য্য-মণ্ডলাভ্যন্তরস্থ দ্রব ঘনীভূত ধাতব পদার্থসকল প্রচণ্ড উত্তাপে ফুটিতে থাকে এবং কখন কখন ভীষণ বেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। তাহাতে ঐ সকল স্থান গভীর গহ্বরের আকার ধারণ করে। সূর্য্যমণ্ডলে যেসকল কলঙ্কচিহ্ন অর্থাৎ কাল কাল দাগ দর্শন করা যায়, তাহা উক্ত প্রকাণ্ড গহ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে। একবার এ প্রকার একটি গহ্বরের বিষয় গণনা করিয়া কোন

কোন জ্যোতিষী বলিয়াছেন যে তাহার ব্যাস (৬০০০০) ষাট হাজার মাইলেরও অধিক। কিন্তু সূর্য্যদেহের তারল্য বশতঃ এ সকল গহ্বর অধিক দিন স্থায়ী হইতে দেখা যায় না, দ্রব পদার্থ দ্বারা শীঘ্রই পূর্ণ হইয়া যায়, আবার নূতন গহ্বরের সৃষ্টি হয়। মার্ত্তণ্ডের মহান অগ্নিময় দেহে সতত এই প্রকার কত গহ্বরের সৃষ্টি ও বিলয় হইতেছে। সূর্য্যদেহে ঝঞ্চাবাত আরও আশ্চর্য্য-জনক ও ভীষণ।

শ্যামসুন্দর ধরা রাজ্য যে বায়ুমণ্ডলে আচ্ছাদিত, তাহা যেন কদম্ব-কেশরের ন্যায়। এই অনিল প্রবাহ ভূমণ্ডলের চারিদিকে ব্যাপ্ত থাকিয়া অবিশ্রান্ত সঞ্চালিত হইতেছে। কখন কখন বা সে বায়ুপ্রবাহে ঝড় উঠিয়া বসুন্ধরাবাসী দিগকে আতঙ্কিত করিয়া থাকে; সেইরূপ এক প্রকার বাষ্পমণ্ডল সূর্য্যের চারিদিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সবিতার নিজ অঙ্গীভূত ধাতব পদার্থ-সকলেরই কিয়দংশ তাহার অসহনীয় উত্তাপে বাষ্পীভূত অবস্থায় মার্ত্তণ্ড অঙ্গের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছে। সেই বাষ্পমণ্ডলও সময় সময় ঝড়ের মত ভীষণবেগে আন্দোলিত হইতে দেখা যায়। তাহাতে সূর্য্যের প্রায় দ্রবীভূত-দেহের কোন কোন অংশ প্রচণ্ড বেগে বহুদূরে উত্থিত হইয়া

থাকে। সূর্য্যদেহস্থিত কলঙ্কচিহ্নসকলের কতকগুলি এই প্রচণ্ড বাত্যা হইতে সমুদ্ভূত। জ্যোতির্বিগণ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে জলস্তম্ভের ন্যায় সেই রবিদেহ হইতে উত্থিত জলন্ত অগ্নিময় দ্রবীভূত অংশ সূর্য্যমণ্ডল ছাড়াইয়া কখন কখন সহস্র সহস্র মাইল পর্য্যন্ত ছুটিয়া যায়। একবার একজন জ্যোতিষী গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, এই প্রকার উত্থিত অংশ চৌত্রিশ সহস্র মাইল (৩৪০০০) পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়াছিল। সেই সময় পৃথিবীবাসী মানব রবিমণ্ডলের কি অপরূপ শোভা দর্শন করিয়া মোহিত হন! আমরা সেই অগ্নিতরঙ্গের অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যের বিষয় কল্পনায় আর কি অনুভব করিব?

পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় একবার স্বীয় মেরুদণ্ডে আবর্ত্তন করে এবং তাহাই দিন রাত্রির কারণ, ইহা সকলেই অবগত আছেন। অনেক গবেষণার পর সূর্য্যের আহ্নিক গতিও নিরুপিত হইয়াছে। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে—ব্রহ্মাণ্ডপতির সৃষ্ট রাজ্যে কিছুই স্থির নাই। সুদূর নীহারিকা হইতে সৌর জগৎস্থিত গ্রহ উপগ্রহগণ সমস্তই ঘূর্ণিত হইতেছে। এমন কি চক্ষুর অগোচর যে পরমাণু সমূহ—ইথারপুঞ্জ তাহাও অবিরাম স্পন্দিত

হইতেছে, পরস্পর আবর্ত্তিত হইতেছে। পৃথিবীর ২৭ দিন সময়ে মার্ত্তণ্ডদেব একবার স্বীয় মেরুদণ্ডে ঘূর্ণিত হন। কেহ কেহ ঐ ঘূর্ণনবেগ ২৫ দিন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্র দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, সূর্য্যমণ্ডল আপনার গ্রহ উপগ্রহ সম্বলিত সৌর জগৎ লইয়া এক মহাসূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমান হইতেছে।

যে মহালোক লক্ষ্য করিয়া মার্ত্তণ্ডমণ্ডল অবিরাম ছুটিয়া যাইতেছে, পৃথিবীবাসী মনুষ্যগণ তাহাকে নক্ষত্র আকারে দর্শন করিয়া থাকে। সে প্রকাণ্ড নক্ষত্রের নাম অভিজিৎ, তাহা আলোক নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহগণ যেমন এক একটি কক্ষ অবলম্বন করিয়া নির্দ্দিষ্ট গতিতে বিমানপথে ছুটিয়া যায় সূর্য্য তেমনি আপন গ্রহ উপগ্রহ সহ একটি কক্ষপথে নির্দ্দিষ্ট গতিতে ছুটিতেছে। বহু গবেষণার পর জ্যোতির্বিদগণ এই সৌরগতির সময় নিরূপণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কিন্তু ইহাতে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়। সুতরাং সৌরগতির নিরূপিত কাল কতদূর অভ্রান্ত তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। কেহ কেহ বলেন, সূর্য্য প্রতি সেকেণ্ডে তের মাইল বেগে আপন

কক্ষে ধাবিত হইতেছে। কাহারও মতে ঐ ঘূর্ণনবেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১১ মাইল।

ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র বলেন— অভিজিৎ তিনটি উজ্জ্বল তারকাযুক্ত নক্ষত্র। আকৃতি একটি বৃন্তহীন পানের ন্যায়।

কোষ্ঠী-প্রদীপ এবং শিরোমণিসিদ্ধান্তে অভিজিৎ নক্ষত্রের বর্ণনা লিখিত হইয়াছে। "অভিজিৎ নক্ষত্রের উদয় সময়ে জন্মগ্রহণ করিলে মানবগণ অতি মনোরম রূপ লাভ করে এবং সজ্জনের আদরণীয় শান্ত প্রকৃতি লাভ করে! বিশেষতঃ দেবতাতে অনুরাগ, যশঃ, গৌরব এবং বাগ্মিতা প্রভৃতি অভিজিৎ নক্ষত্রের জন্মের ফল।"

এই নক্ষত্র ভূমণ্ডলের দক্ষিণ দিকে দৃষ্ট হয়।

আধুনিক প্রতীচ্য জ্যোতির্বিদগণ এই নক্ষত্রের তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য বহু গবেষণায় প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। কিন্তু তাহার গতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু জানিতে পারেন নাই।

আলোক নামক প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে যে সূর্য্যের উত্তাপের পরিমাণ ছয় হাজার ডিগ্রিরও অধিক। এই ভীষণ কিরণরাশি সৌর রাজ্যের সমস্ত গ্রহ উপগ্রহে বিকীরণ করিতে করিতে মহাকায় মার্ত্তণ্ড অবিশ্রান্ত

ধাবিত হইতেছেন। এই সৌর জগৎস্থিত কোন কোন গ্রহে জ্যোতিষিগণ মনুষ্যের ন্যায় প্রাণীর বর্ত্তমানতার লক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছেন। এস্থানে প্রসঙ্গ ক্রমে সৌর জগতের বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইল।

সৌর রাজ্যস্থিত গ্রহ উপগ্রহের সংখ্যা দুই শতেরও অধিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। গ্রহগণের মধ্যে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেন্‌স্ ও নেপচুন এই আটটি প্রধান। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ আছে।

বুধ সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের নিকটতম গ্রহ; রবিমণ্ডল হইতে তিন কোটি তিপান্ন লক্ষ নব্বই হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। বুধ ৮৮ দিনে একবার সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। পৃথিবী এবং মঙ্গলের পূর্ণাবর্ত্তন ২৪ ঘণ্টায় সম্পাদিত হয়। কিন্তু বুধ গ্রহের পূর্ণাবর্ত্তন কাল ৮৮ দিন বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

শুক্র গ্রহ সূর্য্য হইতে ছয় কোটি একষট্টি লক্ষ ত্রিশ হাজার মাইল দূরে অবস্থান করিতেছে। তাহার আবর্ত্তন কাল ২৩ ঘণ্টা ২১ মিনিট মাত্র। শুক্র এবং পৃথিবী এই উভয় গ্রহের মধ্যবর্ত্তী আর কোন গ্রহ নাই। সুতরাং পৃথিবী হইতে শুক্রকে অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখা যায়। সন্ধ্যা-

কালে যে সন্ধ্যাতারা এবং প্রভাত কালে প্রভাতীতারা আকাশে দর্শন করা যায় তাহা শুক্র গ্রহেরই নামান্তর মাত্র। গ্রহগণের অনেকগুলিই চন্দ্র-সম্পদে সুশোভিত। মঙ্গলগ্রহ এবং পৃথিবীর মধ্যেও অন্য কোন গ্রহের ব্যবধান নাই। পৃথিবী হইতে মঙ্গলগ্রহ চারি কোটি আশি লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। কখন কখন মঙ্গলগ্রহ ইহা অপেক্ষা নিকটবর্ত্তী হয়। এই গ্রহ দেখিতে অতি সুন্দর, প্রায় দুইবৎসর সময়ে সূর্য্যকে এক বার প্রদক্ষিণ করে। শুক্র এবং মঙ্গল এই উভয় গ্রহই আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। এই দুই গ্রহই মনুষ্যের ন্যায় বুদ্ধিমান জীবের আবাসভূমি বলিয়া জ্যোতিষিগণ স্থির করিয়াছেন। শুক্র এবং মঙ্গলের রাজ্যে মেঘ, সমুদ্র, পর্ব্বত বৃক্ষাদির অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা নাকি নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। ঐ দুই গ্রহে যদি সত্যই কোন বুদ্ধিমান জীব বাস করে, তাহারা কি প্রকার, এবং তাহাদের আচার ব্যবহারই বা কি, বিজ্ঞান যদি তাহা জানিতে সমর্থ হন, তবে বড় আনন্দের বিষয় হইবে। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এমন অনেক স্থান আছে যাহাতে পৃথিবীবাসী মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর প্রাণী অবস্থিতি করিয়া ভগবানের করুণা অনুভব করিতেছেন।

সূর্য্যের বার্ষিক গতি কত কালে নিষ্পন্ন হয় তাহাও সম্যক্ স্থিরীকৃত হয় নাই।

একই সূর্য্যের মহা আকর্ষণে সৌর জগতস্থিত জ্যোতিষ্কগণ ব্যোমপথে ভ্রাম্যমান! বিশ্ববিধাতার অচিন্তনীয় বিধান কি আশ্চর্য্য! কেহ কাহাকে স্পর্শ করিতেছে না, কেহ কাহারও অনিষ্ট করিতেছে না, অনাদিকাল ব্যাপিয়া জ্যোতিষ্কগণ অবিরাম আপন আপন নির্দ্দিষ্ট পথে ভীষণ বেগে চলিয়া যাইতেছে। মহা আকর্ষণে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে এমনই আকৃষ্ট রহিয়াছে যে চিন্তা করিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। ধন্য সেই সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি এই রবিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন! এই প্রকার কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সূর্য্য তদীয় সৃষ্ট রাজ্যে রহিয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? তাঁহার রাজ্য মধ্যে অহর্নিশি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সাধিত হইতেছে, কত সূর্য্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, কত সূর্য্যের নূতনসৃষ্টি হইতেছে, তাহার সীমা কে করিবে? পূর্ণ হৃদয়ে সেই দেবদেবকে নমস্কার করি।

সার্ব্বভৌমিক প্রেম

কালীনাথ বাবু কহিলেন—"অমরেন্দ্র! শুধু বক্তৃতায় কোন ফল হইবে না। যদি দেশবাসীর প্রকৃত কল্যাণ ইচ্ছা কর, তবে প্রেম চাই; প্রেম বিশ্ববিজয়ী জানিবে। প্রেমের নিকট মস্তক অবনত করিতে, একদিন সকলেই বাধ্য হইবে।"

অমরেন্দ্র,—"মহাশয়, আমি এক্ষণ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছি; নির্জ্জনে যখন আরাধ্যা দেবীর ধ্যান করি, মা যেন প্রাণে প্রাণে প্রকাশিত হইয়া বলিতে থাকেন, আগে তোমার শত শত ভ্রাতাকে প্রীতি কর; জাতিভেদ, বর্ণভেদ, বিস্মৃত হইয়া, হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকলকে সমভাবে প্রেমালিঙ্গনে আপনার করিয়া লও, তবেই মাতৃপূজার অধিকারী হইবে। প্রেমের নিকট স্বদেশ বিদেশ উভয়ই তুল্য। ভ্রাতার শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে কল্যাণের পথে তুলিয়া লও।"

কালীনাথ বাবু—"ইহাই তো প্রকৃত মনুষ্যত্ব। এ স্থানে জাত্যাভিমান, হিংসা, বিদ্বেষের স্থান কোথায়?"

অমরেন্দ্র ভাবপূর্ণ হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন, "পূর্ব্বে

আমি দেশবাসী হইতে কেমন একটা দূরত্ব অনুভব করিতাম। আপনার পাঠ্য পুস্তকেই মনটা নিবিষ্ট ছিল; দেশবাসীর সঙ্গে বড় একটা মিশিবার অবসর পাইয়া উঠি নাই। মাতৃ-সেবায় দীক্ষিত হইবার পর হইতে আশ্চর্য্য শক্তি অনুভব করিতেছি। সকল প্রকার জাত্যাভিমান ও গর্ব্ব যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া একেবারে ধূলিসাৎ হইয়াছে। এখন দেখিতে পাইতেছি, মাতৃচরণে আমি ধূলি অপেক্ষাও অধম, এবং কোটি কোটি ভ্রাতার সহিত আমি অভিন্ন। এখানে হিন্দু মুসলমান, ইংরেজ, বাঙ্গালীর সঙ্গে কোন ভেদ নাই। সকলেই আমার আপনার ভাই। আমার প্রত্যেক রক্তবিন্দু যদি তাহাদের কল্যাণার্থ অর্পিত হয়, তবেই আমার জীবন ধন্য হইবে।" অমরেন্দ্র উচ্ছ্বসিত প্রাণে এই বলিয়া নীরব রহিলেন! তাঁহার স্বাভাবিক তেজঃপূর্ণ মুখমণ্ডল যেন কি এক মহিমামণ্ডিত আভায় দীপ্তি-শালী হইয়া উঠিল।

কালীনাথ বাবু কহিলেন, "নব্য যুবকগণের যেপ্রকার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও উদ্যমশীলতা, তাহাতে তাহাদের যত্নে এবং একপ্রাণতায় দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের অভাবও কতকটা দূর হওয়ার সম্ভাবনা।"

অমরেন্দ্র,—"অনেক দেশহিতৈষী ব্যক্তি জননী জন্মভূমির কল্যাণার্থ শিল্পচর্চ্চার জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতেছেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টেরও এ বিষয়ে বিশেষ সহানুভূতি আছে।"

কালীনাথ বাবু.—"যেকোন বিষয়েই হউক কার্য্য সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে তিতিক্ষার আবশ্যক। নব্য যুবকের উদ্দাম হৃদয়াবেগজনিত অধীরতায় অনেক সময় কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে বিঘ্ন ঘটে। উন্নতিশীলতার একটা দিক্ আছে। যেমন একটি প্রাসাদ প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহার ভিত্তিমূলের দৃঢ়তার আবশ্যক. স্থিরভাব ইষ্টক খণ্ডের উপর ইষ্টকখণ্ড স্থাপন পূর্ব্বক অতি সাবধানে সুদক্ষ শিল্পী অতি বৃহৎ অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া থাকেন, তেমনিই স্বদেশের হিতকল্পে কোন কার্য্যপ্রণালী সংগঠন করিতে হইলে, অতিশয় ধৈর্য্য ও সাবধানতার আবশ্যক এবং তাহার ভিত্তিমূলের দৃঢ়তার প্রয়োজন।

অমরেন্দ্র,—"আপনি কাহাকে ভিত্তিমূল বলেন?"

কালীনাথবাবু—"নৈতিক নিষ্ঠাই তাহার ভিত্তিমূল। কি রাজনৈতিক, কি সমাজনৈতিক, যে কোন বিষয়ে দৃষ্টিপাত কর না কেন, নৈতিক নিষ্ঠার দৃঢ়তাই উহাকে

অক্ষুণ্ণ রাখে ও শক্তিসম্পন্ন করিয়া তোলে। নৈতিক নিষ্ঠার শিথিলতায় দেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির প্রয়াস বালুকার উপরিস্থিত প্রাসাদের ন্যায়, ভূমিসাৎ হয়। জগতের ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে।"

অমরেন্দ্র,—"যত দূর সম্ভব নৈতিক নিষ্ঠা রক্ষা করিতে যত্ন করা হইতেছে।"

কালীনাথ বাবু,—"একটা সার্ব্বভৌমিক প্রীতির আবশ্যক। ইহা নৈতিক নিষ্ঠার আর একটা দিক্। দ্বেষ হিংসা দ্বারা কখনও দেশের মঙ্গল হইবে না। এই তো দেখ ভ্রাতায় ভ্রাতায় কেমন দলাদলি আরম্ভ হইয়াছে। সকলেই এক মায়ের সন্তান; মাতার দুঃখ দারিদ্র্য দূর করা সকলেরই জীবনের উদ্দেশ্য; তবে এ দলাদলি কেন? আর কি ভারতে দলাদলি সাজে? দেখিতেছ না, দারিদ্র্য ও অন্নাভাবে দেশ জীর্ণশীর্ণ? শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি ভিন্ন ভারতের আর উপায় নাই। এই উন্নতির নিমিত্ত ত্রিশ কোটি ভ্রাতা ভগিনী সমস্ত হিংসা দ্বেষ বিসর্জ্জন দিয়া সম্মিলিত হও। পরস্পরের অশ্রু পরস্পরের অশ্রুতে মিশাইয়া মায়ের চরণতলে এক হও। ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ

করিয়া আর কেন জননীর বক্ষে শেলাঘাত কর ?”

অমরেন্দ্র,—“দলাদলি এবং বিদ্বেষই যে সর্ব্বনাশের কারণ, তাহার আর ভুল কি ? ভারতবাসীগণ এই প্রকার দলাদলি এবং সর্ব্বপ্রকার বিদ্বেষবুদ্ধি যদি ত্যাগ না করেন, তবে ভারতবর্ষের মঙ্গলের আশা বৃথা।”

কালীনাথ বাবু,—“ভারতবর্ষ পুণ্য ভূমি। যুগযুগান্ত ব্যাপিয়া জগৎ ইহাকে পুণ্যের আদর্শ স্থান বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছে। সহস্র সহস্র বৎসর হইতে ভারতবর্ষ প্রীতি এবং ত্যাগের আদর্শরূপে গণ্য হইয়া রহিয়াছে। সেই ভারতবর্ষে—পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে, যদি গুপ্তহত্যা প্রভৃতি মহাপাপের স্থান হয়, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কিছুই নাই। গুপ্তহত্যা অতিশয় ঘৃণনীয় এবং নীচাশয়তার কার্য্য। রাজনৈতিক গুপ্ত-হত্যা অতিশয় নিন্দনীয়। যে ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া ভারত আজও প্রেমবলে, পবিত্রতাবলে, সমস্ত পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠস্থান-অধিকার করিয়া রহিয়াছে, এই সমস্ত মহা-পাপের দ্বারা সেই সুদৃঢ় ভিত্তিমূল শিথিল হইয়া যাইবে। ইহা দ্বারা আমরা সভ্য জগতের সহানুভূতি হারাইব। ইংরেজদিগের মধ্যে যেসকল প্রকৃত হিতৈষী ব্যক্তি

প্রাণপণে ভারতের কল্যাণ সাধনে রত, গুপ্তহত্যার পাশবিক কার্য্যদ্বারা আমরা তাঁহাদেরও সহানুভূতি হারাইব। ভারতের বিজয়রত্ন কখনও রক্তাক্ত নহে। সাম্য-মৈত্রীর বৈজয়ন্তী গগনে উড্ডীন করিয়া ভারতবাসী জগৎজয় করিয়াছে। যাহারা গুপ্তহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত, তাহারা দেশের প্রকৃত শত্রু। ভারতের প্রাণস্বরূপ নব্য যুবকগণ কেন এ পাপে লিপ্ত হইবেন।"

অমরেন্দ্র,—"রাজনৈতিক হত্যাকারীর মঙ্গল কোথায়? যাহাতে দেশমধ্যে এই সমস্ত মহাপাপের স্থান না হয়, সকলেই সে বিষয়ে যত্ন করিবেন, সন্দেহ নাই।"

কালীনাথ বাবু,—"পাপ ও অপবিত্রতার সঙ্গে সংগ্রামই প্রকৃত বীরত্ব। ইহা নৈতিক নিষ্ঠার একটা দিক্। জাতিবিদ্বেষরূপ ঘোরতর পাপ দেশকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে। শত শত কুসংস্কার আবর্জ্জনারূপ পাপকীট সমাজবক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া ইহার অস্থিপঞ্জর পর্য্যন্ত বিনাশ করিতেছে। তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। বাল্যবিবাহ দেশ হইতে নির্ব্বাসিত কর। জাতি-বিদ্বেষ দূর করিতে দৃঢ়ব্রত হও। যাহারা এ সকল পাপ আবর্জ্জনার সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহারাই প্রকৃত বীরপুরুষ।"

অমরেন্দ্র—"প্রতীচ্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের মতে খ্রীষ্টের জন্মের ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ভারত যখন জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত ছিল, সেই সময় ভারতের শিল্প বাণিজ্য উন্নতির চরম সীমায় উত্থিত হইয়াছিল। ভারতের বাণিজ্য-তরণীসকল অপার সমুদ্র-বক্ষ পার হইয়া দিক্‌দিগন্তে ধাবিত হইত। ভারতের শিল্প বাণিজ্য বলীদ্বীপ এবং অন্যান্য দেশেও প্রসারিত ছিল। শিল্পকলা এবং জ্ঞান গরিমায় ভারত যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, আজও ঐ সকল দেশ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। স্থবর্ণ যুগে ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতা যবদ্বীপে সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

"পুরাকালে যুবরাজ সিংহবাহু সিংহলে গমন করেন; এবং পাণ্ড্যরাজকুমারী বহু রাজকর্ম্মচারী ও ক্রীতদাস এবং অনেক রাজকন্যাসহ সিংহলে গমন করিয়াছিলেন।

"ভারতের বাণিজ্য-তরণীসকল কেবল ভারত মহাসাগরে নয়, অন্যান্য মহাসাগরেও বিচরণ করিত, ইহা ইংরেজ গ্রন্থকারগণ স্বীকার করিয়াছেন।

পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকাহিনী আজ তাঁহাদের বংশধরের নিকট উপাখ্যানের আকার ধারণ করিয়াছে। যে সমুদ্রযাত্রা একদিন আর্য্যজাতির গৌরবের বিষয় ছিল,

বহু শতাব্দী পর তাঁহাদের বংশধরগণের নিকট আজ সেই সমুদ্রগমন নিষিদ্ধ! এই প্রকারে দেশবাসী কমলাকে বিদেশে নির্ব্বাসিত করিয়া ভারতের উন্নতির পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। হায়, ভারতের কি শোচনীয় দুর্গতি!"

কালীনাথ বাবু,—"জানিনা, কবে এ দুর্গতির অবসান হইবে। ভারতবাসীর গৃহবিচ্ছেদ, অন্ধতা এবং অপরিণামদর্শিতাই এসকল অনর্থের মূল। আজকাল অনেক সুশিক্ষিত হিন্দু যুবক সমাজের কুসংস্কার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া সমুদ্রপথে বিদেশ গমন করিয়া থাকেন। সকলেই যদি এ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন, তাহা হইলে সমাজ-নেতৃগণ তাঁহাদের বিধি ব্যবস্থার কঠোরতাও শিথিল করিতে বাধ্য হইবেন।"

অমরেন্দ্র,—"সমাজের এই সমস্ত কলঙ্ক দূর না হইলে ভারতের উন্নতি কোথায়?"

অমরেন্দ্র কিছুকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর আবার দৃঢ়তার সহিত কহিলেন,—"আমি সর্ব্বোপরি এই জাতিবিদ্বেষকে প্রাণের সহিত ঘৃণা করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইংরেজ, বাঙ্গালী, হিন্দু, খৃষ্টান সম্মিলন ভিন্ন ভারতবর্ষের কল্যাণ নাই। এইপ্রকার সার্ব্বজনীন

সম্মিলন এবং প্রীতির ভিত্তির উপর জাতীয় উন্নতির সোপান প্রতিষ্ঠা করাই আমার জীবনের প্রধান ব্রত। কারণ যাহার বলে আর্য্যজাতি জগৎপূজ্য, তাহার মূলমন্ত্র এই সার্ব্বজনীন প্রেম। সেই প্রেমকে বাদ দিলে ভারতের আর কি অবশিষ্ট থাকে? দেশের শত শত অভাবের বিষয় চিন্তা করিয়া আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে। আমি আশা করি, বাঙ্গালী যদি সমস্ত হিংসা বিদ্বেষ দূর করিয়া প্রেমের ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারেন, মাতৃ-ভূমির সমস্ত অভাবই দূর হইয়া যাইবে। ইংরেজ আমাদের পর নহেন। আমরা যদি আপনার কল্যাণ কামনা করি, তবে ইংরেজকেও ভালবাসিতে হইবে, তাহার কল্যাণ চিন্তা করিতে হইবে। কারণ জগতের এই যে অনন্ত জীব-প্রবাহ, ইহাদের প্রত্যেকের কল্যাণের উপর আপনার কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে, ইহা অভ্রান্ত সত্য।"

কালীনাথবাবু তখন সেই নব যুবকের বিশ্বপ্রেমে উদ্দীপ্ত লাবণ্যময় মুখমণ্ডলের প্রতি সবিস্ময়ে চাহিলেন। দেখিলেন, সে উজ্জ্বল, প্রশান্ত ললাট যেন বিধাতার অক্ষরচিহ্নে চিহ্নিত। শ্রদ্ধাভরে অমরেন্দ্রের করপল্লব স্বকরে গ্রহণ পূর্ব্বক গম্ভীর ভাবে কহিলেন,—

"অমরেন্দ্র তুমি ঠিক্ই বলিয়াছ। এই সার্ব্বভৌমিক প্রীতি ভিন্ন জাতীয় দুর্গতি কখনও দূর হইবে না। আজও ইংরেজের যাহা আছে, তুলনায় বাঙ্গালীর কিছুই নাই। ইংরেজের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, স্বদেশ বাৎসল্য, একতা কর্ম্মে উৎসাহ কয়জন বাঙ্গালীর মধ্যে দেখা যায়? যাঁহাদের আছে, তাঁহারাও সমুদ্রে জলবিম্ববৎ। ইংরেজের এ সকল গুণ কি বাঙ্গালীর অনুকরণীয় নয়? বাঙ্গালী ১০ জনে মিলিয়া একটা কাজ করিতে পারে না।"

অমরেন্দ্র,—"দেশের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সার্ব্বভৌমিক প্রীতির উপর নির্ভর করিতেছে। বিধর্ম্মী, বিদেশীয়-দিগকেও প্রাণের সহিত প্রীতি করিতে না পারিলে, কখনও স্বদেশের গৌরব প্রতিষ্ঠা হইবে না।" *

---

* লেখিকার "অমরেন্দ্র" নামক উপন্যাস হইতে

ছায়া-পথ

অনন্ত নীল আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ,—মরি মরি! কি অপরূপ শোভা! হাজার হাজার হীরার ঝাড় যেন ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছি! উজ্জ্বলে মধুর, মধুরে মহান্! এ মহত্ত্ব ও মধুরতার সংমিশ্রণে কি এক অনির্ব্বচনীয়, অভাবনীয় মহাশক্তির বিকাশ অনুভূত হইতেছে।

যখন তামসী রজনীর কৃষ্ণছায়ায় মেদিনীর শ্যাম সুন্দর কলেবর আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে, যখন শ্রান্ত ক্লান্ত জীবকুল বিরামদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে শয়ান হইয়া,—কর্ম্মক্ষেত্রের অনন্ত শ্রম ক্লেশ বিস্মৃত হয়, সেই সময় একবার সুন্দর নীল নভোমণ্ডলের বিশ্বমোহন কান্তি অবলোকন করিলে কি আনন্দে প্রাণ পরিপূর্ণ হয়! যেন স্বর্গীয় উদ্যানে কোটি কোটি পুষ্প স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুটিত! অথবা যেন বৈজয়ন্তপুরীর সহস্র সহস্র দ্বার উন্মুক্ত করিয়া অগণিতসুর-সুন্দরী অনিমেষ নয়নে মর্ত্ত্যবাসীদিগকে দর্শন করিতেছেন। যেন কোন অজ্ঞাত রাজ্যের বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া সেই নীরব নিস্তব্ধ নিশীথে প্রকৃতিদেবী এক মহাধ্যানে নিমগ্ন! সেই সময় অনন্ত সত্য সুন্দর চিদ্‌ঘন মাধুরী প্রাণের উপর কেমন পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

নক্ষত্রপুঞ্জের আকৃতি, গতি, দূরত্ব প্রভৃতি নির্দ্ধারণের নিমিত্ত যুগে যুগে মনীষিগণ গভীর গবেষণায় রত রহিয়াছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁহারা সেই ভূমা মহেশ্বরের মহিমার জ্বলন্ত নিদর্শন স্বরূপ নক্ষত্রপুঞ্জের বিষয় অতি অল্পই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইয়াছেন।

যে সময়ে পাশ্চাত্য জগতের অনেক দেশই ঘোর তমসাচ্ছন্ন ছিল, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারত যখন জ্ঞানের সূর্য্যকিরণে প্রদীপ্ত ছিল, সেই সময়েও ভারতে জ্যোতিষতত্ত্বের আলোচনা অল্প ছিল না। খনা প্রভৃতি অসামান্য প্রতিভাশালিনী মহিলাগণও জ্যোতির্ব্বিদ্যায় অলৌকিক পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন ; সে সমস্ত বিষয় এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে।

নীরদমুক্ত নির্ম্মল আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে, সুদূর ব্যোমপথে নক্ষত্র-বিরচিত এক কিরণময় মণ্ডল নয়নগোচর হয়। উহা নীল অসীম দীগন্তের উত্তর-পশ্চিম ব্যাপিয়া যেন দ্যুলোককে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া মহাপথের তুল্য বিস্তৃত, এবং আলোকমালায় উদ্ভাসিত রহিয়াছে। তাহার নাম ছায়াপথ।

জ্যোতিষ্ক-বিমণ্ডিত মহামহিমাময় ব্যোমের দুর্জ্জেয় সরণী পরিভ্রমণ করিতে মানব-মনের সাধ্য কি?

মানবের ক্ষুদ্র জ্ঞান বুদ্ধি দূর হইতেই প্রতিনিবৃত্ত হয়। এই ছায়াপথের আকৃতি সর্ব্বত্র এক প্রকার নহে। বিবিধ বিচিত্রপূর্ণ বিশ্ব-চিত্রপটের একটি অপরূপ চিত্র ছায়াপথের বৈচিত্রও সামান্য নহে। ইহা কোথাও অল্প বিস্তৃত, কোথাও অধিক বিস্তৃত কোথাও বা সামান্য রেখাবৎ। কোথাও অতিশয় উজ্জ্বল, কোথাও অনুজ্জ্বল, অল্প আলোকবিশিষ্ট প্রতীয়মান হয়। এই সমস্ত নক্ষত্র-পুঞ্জের আকৃতি ও বর্ণ এক প্রকার নহে। অপূর্ব্ব বিভিন্নতা সত্ত্বেও কি আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য!

এই ছায়াপথ সম্বন্ধে নানাদেশে নানাপ্রকার গল্প প্রচলিত আছে। প্রাচীন রোমবাসীগণ উহাকে সৌর-জগতের কিরণদাতা সবিতাদেবের পথ বলিয়াছেন, তাহাদের মতে এই পথ দিয়াই গ্রহরাজ সূর্য্য পূর্ব্বাচলে এবং পশ্চিমাঞ্চলে গমনাগমন করেন। প্রাচীনযুগে যে গ্রীকগণ সভ্যতা. শিল্প. বাণিজ্য বিদ্যা বুদ্ধি এবং অন্যান্য গুণ গরিমায় উন্নতির সমুচ্চ শিখরে উত্থিত হইয়াছিলেন, সে সময়ে তাঁহারাও এসম্বন্ধে কুসংস্কার বর্জ্জিত ছিলেন না। তাঁহারা ছায়াপথকে দেহমুক্ত আত্মার স্বর্গগমনের পথ বলিয়াছেন। অথবা সাধারণের মনোরঞ্জনার্থ কবির কি চমৎকার কল্পনা! কবিকল্পনার এমন মনোহর আশ্রয় ছায়া-

পথের স্থায় দ্বিতীয় বস্তু আর কি আছে? সকল দেশেই প্রাচীন কবিগণ সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিশ্রিত করিয়া যেন এক অপূর্ব্ব আমোদ অনুভব করিতেন। চীনের অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক ছায়াপথ মনোহর অমরাপুরীর পুণ্য সলিলাপ্রবাহিনী তরঙ্গিনীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ভারত কাহারও পশ্চাৎবর্ত্তী নহে। ভারতবর্ষের অশিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে এ সম্বন্ধে নানাপ্রকার কল্পিত ব্যাখ্যা শ্রবণ করা যায়। চিরকল্পনাপ্রিয় ভারতবাসিগণ এমন মাধুর্য্য ও মহিমাপূর্ণ বিষয়ে কেননা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন?

জ্যোতিষী পণ্ডিতগণ ছায়াপথ সম্বন্ধে কি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, এপ্রবন্ধে তাহাই কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব।

ছায়াপথ স্তবকে স্তবকে নক্ষত্র অথবা সূত্রগ্রথিত মুক্তা সমূহের স্থায় নক্ষত্রের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই নক্ষত্রগুলি স্তরে স্তরে সুসজ্জিত। কোথাও বা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, বিশৃঙ্খল ভাবে রহিয়াছে,—তাহাও স্তরে স্তরে। নৌকাপথে চলিতে চলিতে খরস্রোতা তটিনীর তীরে মৃত্তিকাস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। একটি স্তরের উপর আর একটি স্তর কেমন সাজান রহিয়াছে। এই ছায়াপথের নক্ষত্রস্তর সেই প্রকার নহে। নীচের

স্তরের নক্ষত্রগুলিও সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু অনুজ্জ্বল। এই নক্ষত্রস্তরের নির্ণয় বিষয়ে ও জ্যোতির্বীগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কোন কোন স্থলে ছায়াপথের নিম্ন-স্তরস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জ এত অস্পষ্ট যে ধূমপুঞ্জের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

এই নক্ষত্রগুলির জ্যোতি অসামান্য। অতিশয় দূরত্ব বশতঃ দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাও মানবচক্ষে ক্ষীণালোক বিশিষ্ট বলিয়া প্রতীতি জন্মে। একটি সূর্য্যের আলোক রাশিতে সমস্ত সৌরজগৎ উদভাসিত এবং রক্ষিত। জ্যোতিষ শাস্ত্র দ্বারা নিঃসংশয় রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে. এ অগণিত নক্ষত্রমালার এক একটির জ্যোতিঃ মহাজ্যোতিষ্মান্ সূর্য্য অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।

প্রত্যেকটি নক্ষত্র আকৃতিতে সূর্য্যের তুল্য বিশাল-কায়; কোনটি বা সূর্য্যের অপেক্ষাও বৃহত্তর হইবে! অসীম মহাব্যোম ব্যাপিয়া এই মহাজ্যোতিষ্ক সকল অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিতেছে! এক মহাআকর্ষণ শক্তিতে পরস্পর অনন্ত শূন্যে আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এই আকর্ষণই বা কেমন? এবং তাহার স্রষ্টাই বা কি মহান! সেই অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন পুরুষ বিশ্ববিধাতার অচিন্তনীয় সৃষ্টিতত্ত্বের অসীমত্ব আমরা কীটানুকীট কেমন

করিয়া ধারণা করিব? চিন্তা করিতে চিন্তাশক্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে। তিনি কোন্ উদ্দেশ্যে এই অনন্ত রবি পুঞ্জের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং কোন্ উদ্দেশ্যেই বা সৌরজগৎ পরিবেষ্টিত রবিস্তবক-স্তর-শোভিত ছায়াপথের রচনা করিয়া আপনার মহামহিমান্বিত লীলা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা কে বুঝিবে? সেই বিস্ময়কর তত্ত্বের এক কণাও মানববুদ্ধির গম্য নহে। মনুষ্যের ক্ষুদ্র বুদ্ধিপ্রসূত সামান্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা সেই মহাসৃষ্টির অতি সামান্য অংশই দৃষ্টি গোচর হয়। এই মহা বিশ্ব-কার্য্য যাঁহার রচনা তিনি ইহাতে প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠিত।

এই মহত্ত্বের কূল কিনার না পাইয়া হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ অজ্ঞেয়তাবাদী প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ মহান্ সৃষ্টিতত্ত্ব হইতে ব্রহ্মতত্ত্বকে পরিহার করিতেই চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু ভারতের পরম জ্ঞানী মহর্ষিগণ জলদগম্ভীরনাদে ঘোষণা করিয়াছিলেন,—"এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সেই মহান্ পুরুষে অবস্থিত রহিয়াছে।"

নক্ষত্রপুঞ্জ দূরত্ব বশতঃই এত ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। নক্ষত্রগুলি পরস্পর সুদূরবর্ত্তী হইলেও যে ধরাতল হইতে এত ঘন সন্নিবিষ্ট প্রতীয়মান হয়, দূরত্বই তাহার একমাত্র কারণ।

ধরণী হইতে নক্ষত্রমণ্ডলের দূরত্ব নির্ণয় করিতে যাইয়া জ্যোতিষগণ শ্রান্ত ক্লান্ত হইতেছেন। কিন্তু যুগান্তরব্যাপী অবিশ্রান্ত গবেষণার দ্বারাও আজ পর্য্যন্ত তাহাদের দূরত্ব নিঃসংশয়রূপে নিরূপিত হয় নাই। সৌরজগৎ হইতে ছায়াপথ কত দূরে অবস্থিতি করিতেছে তাহা স্থির করিতে কেহই সম্যক্ সমর্থ হন নাই।

আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ আশী হাজার মাইল (১৮০০০০)। দুই জন জ্যোতিষী পণ্ডিত (ডাঃ গিল এবং ডাঃ এলকিন) লুব্ধক নামক নক্ষত্রের দূরত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ঐ নক্ষত্র হইতে আলোকরাশি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮০০০০ হাজার মাইল ছুটিয়া, পৃথিবীতে পঁহুছিতে ৯ বৎসর সময় অতিবাহিত হয়। এরূপ অসংখ্য নক্ষত্র রহিয়াছে যাহারা লুব্ধক হইতেও বহু সহস্র গুণ দূরে অবস্থিত। কোন কোন নক্ষত্র হইতে ধরাবাসীর নিকট আলোক পঁহুছিতে নয় হাজার বৎসর সময় অতিবাহিত হয়। তাহাদের দূরত্ব কত বিস্ময়কর তাহা কল্পনার অতীত। যে আলোক প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ আশী হাজার মাইল দ্রুত ধাবিত হয়, তাহা ধরণী রাজ্যে পঁহুছিতে নয় হাজার বৎসর সময় অতিক্রম করিয়া থাকে।

নক্ষত্রপুঞ্জ গমনশীল হইলেও অতিশয় দূরত্ব বশতঃ তাহারা স্থির বলিয়া মনে হয়।

আকাশের ইতস্ততঃ অনেক স্থানেই নক্ষত্রপুঞ্জ স্তবকে স্তবকে দৃষ্ট হয়। একবৃন্তে বহু পুষ্পের ন্যায় যেন গুচ্ছে গুচ্ছে সজ্জিত রহিয়াছে।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা বহু দূরে যে অস্পষ্ট আলোক বিশিষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জ দৃষ্ট হয় তাহার নাম নীহারিকা। সমুদ্র বেলাস্থিত সিকতাস্তূপের ন্যায় কত স্তরে স্তরে অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জ ধূমবৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে ইহারা সকলেই এক একটি জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য! এবং সম্ভবতঃ সকলেই এক এক সৌরজগৎ অধিকার করিয়া রহিয়াছে!

আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! বিস্ময়ে বাক্য নিস্তব্ধ হইয়া পড়ে! হৃদয় কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবরসে অভিষিক্ত হইতে থাকে। সীমাশূন্য—অন্তশূন্য ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টার অসীম শক্তির বিষয় চিন্তা করিতেও আমরা সমর্থ নহি। কেবল অবনত মস্তকে ভক্তিপরিপ্লুত প্রাণে সেই মহা শক্তিময় জ্ঞানময় পুরুষকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হই। ইহাতেই আমাদের মানবজন্মের সার্থকতা।

প্রকৃত বন্ধুতা

আজ বাসন্তী পূর্ণিমা। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আশ্রমের ছাদের উপর প্রিয়নাথ একাকী উপবিষ্ট। দুই একটি শ্রান্ত বিহঙ্গম মাথার উপর দিয়া কুলায় অন্বেষণে চলিয়া গেল। ক্রমে জবাকুসুমপ্রতিম দিবাকর অস্তাচল চূড়ায় আরোহণ করিলেন। সূর্য্যাস্তের কি অপরূপ শোভা! নীল-আকাশে কে যেন সোণা ঢালিয়া দিল। সে সোণালী আভায় ধরণী রঞ্জিত হইয়া উঠিল। প্রিয়নাথ অনিমেষ নয়নে অস্তগামী রবির ভুবনমোহন কান্তি দর্শন করিতে লাগিলেন।

প্রকৃতির মহিমাময় দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তাঁহার মানস-পটে একটি জীবন্ত চিত্র ভাসিয়া উঠিল। সেই মহাপুরুষের জটাবিলম্বিত,—বিভূতি-ভূষিত,—জ্যোতির্ম্ময় মহামহিমান্বিত মূর্ত্তি! এ মূর্ত্তি যেন তাঁহার হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। মানস-চিত্রপটে স্মৃতির-তুলিকায় রঞ্জিত এ ছবি দেখিতে দেখিতে ক্রমে বাহ্য জগৎ বিস্মৃত হইলেন।

তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—"জ্ঞান-সমুদ্র মন্থন করিয়া কূলের চিহ্নও তো দেখিতে পাইতেছি না। এ যে

অনন্ত, অপার। কিছুতেই প্রাণ তৃপ্ত হইতেছে না।
শ্রুতিতে পাঠ করিয়াছি, ভগবান্ একমাত্র সুখস্বরূপ—
আনন্দময়। তাহার একবিন্দুও পাইতেছি না কেন?
দিবানিশি গভীর জ্ঞানালোচনায় আমার প্রাণ আনন্দে
পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে কই? সেই পূর্ণানন্দ তবে কোথায়?
তাঁহাকে কেমন করিয়া লাভ করিব? বোধ হয় নির্জ্জন
গিরিকন্দরে সাধনা করিলেই সে পরমানন্দস্বরূপের দর্শন
লাভ হইবে। লোককোলাহলই যত অনিষ্টের মূল।
জন-সমাজ ত্যাগ না করিতে পারিলে আমার সকলই
বৃথা।"

প্রিয়নাথ ভ্রান্তিবশতঃ বুঝিতে পারিলেন না যে, যোগ
ও কর্ম্ম ভিন্ন সমস্ত সাধনাই নিষ্ফল। আমরা জগতের
সকল মহাপুরুষগণকেই দেখিতে পাই, তাহারা জ্ঞান,
ভক্তি, কর্ম্মের সম্মিলিত ভিত্তির উপর আজীবন
দণ্ডায়মান।

প্রিয়নাথ পুনর্ব্বার ভাবিতে লাগিলেন,—"অমরেন্দ্রকে
দেখিলে আমার বনে যাইতে ইচ্ছা হয় না।

"অমরেন্দ্র—অমরেন্দ্র! কি আনন্দময় মূর্ত্তি! তাহার
স্মরণেও সুখ। ঐ প্রেম-প্রস্রবণ এ সংসার-মরুতে আমার
প্রাণকে শান্তি-বারি সিঞ্চনে সিক্ত করিতেছে। কিন্তু

ঈশ্বরলাভের জন্য আমি অমরেন্দ্রকেও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইব।” এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

এমন সময় অমরেন্দ্র সেখানে প্রবেশ করিলেন। প্রিয়নাথ এতদূর চিন্তামগ্ন ছিলেন যে, প্রিয়বন্ধুর আগমনও জানিতে পারিলেন না।

অমরেন্দ্র প্রিয়নাথের পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে তাঁহার হাত ধরিয়া ডাকিলেন—“প্রিয়নাথ!”

অকস্মাৎ ধ্যানভঙ্গে প্রিয়নাথ কিঞ্চিৎ চমকিত হইলেন। প্রিয়স্পর্শে তাঁহার প্রাণ আনন্দিত হইল; কিন্তু কিছু আর বলিলেন না। বাহ্যিক আদর তিনি জানিতেন না।

অমরেন্দ্র,—“প্রিয়নাথ, কি ভাবিতেছ?”

প্রিয়নাথ,—“বেশী কিছু নয়, ভাই।”

এই অল্প সময় মধ্যেই যে দুই ঘণ্টা সময় চলিয়া গিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

অমরেন্দ্র তখন সত্যরঞ্জনের বিবাহবিষয়ক সমস্ত কথাই আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন।

প্রিয়নাথ এই অবসরে আপনার মনকে পৃথিবীর কার্য্যের দিকে টানিয়া লইলেন।

অমরেন্দ্র,—“সেই পণ্ডিতদিগের সভায় উপস্থিত থাকিলে তুমি অতিশয় আনন্দ লাভ করিতে।”

প্রিয়নাথ,—“সে আনন্দের ভাগটা তোমার বিবাহ সভায়ই পূর্ণ করিব।”

অমরেন্দ্রের মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল।

প্রিয়নাথ,—“এই মাসের মধ্যেই তোমার বিবাহের দিন ধার্য্য করিতে চাই।”

অমরেন্দ্র,—“এত ব্যস্ততা কেন?”

প্রিয়নাথ,—“তোমার বিবাহ হইলেই আমি একটু নিশ্চিন্ত হইতে পারি।”

অমরেন্দ্র,—“এখন কাজের কথা বল। আমেরিকা কবে যাওয়া হইবে? সেখানে যাইয়া শিল্পশিক্ষার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। আর বিলম্ব করিতে পারি না।”

প্রিয়নাথ,—“বিবাহের পর আমেরিকা যাইও।”

অমরেন্দ্র,—“পূর্ব্বেই সেখানে যাইতে মনস্থ করিয়াছি।”

প্রিয়নাথ,—“কালীনাথবাবু সেদিন জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, বিবাহের দিন কবে স্থির করিতে পারিবেন। শীঘ্র বিবাহ হওয়াই তাঁহার ইচ্ছা।”

অমরেন্দ্র,—"তা হবে না প্রিয়নাথ! আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসি, বিবাহ যখন হয় হইবে।"

প্রিয়নাথ অমরেন্দ্রের প্রকৃতি জানিতেন। সুতরাং বিরুদ্ধ তর্ক নিষ্ফল জানিয়া কহিলেন,—"তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।"

অমরেন্দ্র,—"এখন তবে আমেরিকা যাত্রার দিন স্থির কর। তোমার মার সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে না?

প্রিয়নাথ,—"আমার আমেরিকা যাওয়া হইবে না।"

অমরেন্দ্র,—"সেকি প্রিয়নাথ! এরই মধ্যে মত পরিবর্ত্তন?"

প্রিয়নাথ,—"আমার যাওয়ার ইচ্ছা নাই।"

অমরেন্দ্র,—"সেকি ভাই!"

প্রিয়নাথ,—"কোন একটি বিশেষ ভাব আমার প্রাণে প্রবিষ্ট হইয়া আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। কিছু-দিন যাবৎ তাহার প্রগাঢ়তা বুঝিতেছি।"

অমরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—"এমন কি কথা যে আমি জানিতে পারি না।"

প্রিয়নাথ,—"তোমার নিকট আমার কিছুই গোপন নাই, পাছে তুমি প্রাণে বেদনা পাও, এজন্য তোমাকে বলিতে পারিতেছি না।"

উভয়ের করে করবদ্ধ তেমনি ভাবে রহিয়াছে। অমরেন্দ্র আভাসে পূর্ব্বেই কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বিষণ্ণভাবে কহিলেন,—"কি কথা প্রকাশ করিয়া বল।"

প্রিয়নাথ,—"অমরেন্দ্র, প্রাণের ভাই! আমি জানি তুমি সাধারণ লোক হইতে ভিন্ন। ভগবান্ তোমাকে পতাকাচিহ্নিত করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন; মায়ের চরণতলে তুমি সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে বলিদান করিয়া অগ্রসর হইতেছ; তাই তোমাকে বলিতে পারিতেছি। আমার আর সংসারে মন নাই। হিমালয়ের কোন নির্জ্জন অরণ্যে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে।"

এই কথায় অমরেন্দ্র নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে কহিলেন,—"একি কথা প্রিয়নাথ!"

প্রিয়নাথ,—"অমরেন্দ্র, আমি যাহা বলিতেছি শোন। তুমি আমেরিকা যাও; ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত আমি এই কলিকাতায়ই তোমার প্রতীক্ষায় বাস করিব। পরে তোমাদের দুজনের হস্ত বিবাহ-বন্ধনে সম্মিলিত করিয়া আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিব।"

অমরেন্দ্র বুঝিতে পারিলেন যে জীবন-পথে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা না করাতেই তাঁহার

এপ্রকার মতিভ্রম ঘটিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ, মৌন অবলম্বন-পূর্ব্বক বিষণ্ণ মলিন মুখে উত্তর করিলেন,—

"প্রিয়নাথ, তোমার তুল্য পবিত্রাত্মা ব্যক্তির আবার সংসার ও বনে প্রভেদ কি? সর্ব্বত্রই তোমার সন্ন্যাস। মূলেই কেন ভুল বুঝিতেছ? নিষ্কাম কর্ম্মই কি প্রকৃত সন্ন্যাস নহে? কর্ম্মফল ত্যাগই কি যথার্থ যোগ নয়? তুমি নানাশাস্ত্রে পারদর্শী, তোমাকে আর কি বুঝাইব?"

প্রিয়নাথ,—"কত প্রাতঃস্মরণীয় লোক সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন।"

অমরেন্দ্র,—"তাঁহাদের উদ্দেশ্য কর্ম্মত্যাগ নহে। ত্যাগের অর্থ কর্ম্মত্যাগ নয়;—স্বার্থত্যাগ। যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই কর্ম্মবীর। বুদ্ধ, চৈতন্য কি কর্ম্ম ত্যাগের জন্য সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন?—না। কর্ম্মের সফলতাই তাঁহা-দের সংসার ত্যাগের উদ্দেশ্য। সেই কর্ম্মের সফলতার জন্য তাঁহারা জগৎপূজ্য। তাঁহারা যে কার্য্য করিয়াছে তাহার তুলনা নাই।"

প্রিয়নাথ,—"নির্জ্জন ধ্যানই আমার একমাত্র শান্তি। কর্ম্মে তৃপ্তি পাই না।"

অমরেন্দ্র,—“এই প্রকার সংসার ত্যাগ কি এক প্রকার স্বার্থপরতা নহে? জগতের কল্যাণের জন্যই ভগবান্ জীবকে সংসারে প্রেরণ করেন নতুবা সংসারে আগমনের আমাদের সার্থকতা কি? বিশেষতঃ, তোমার তুল্য পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ যদি বনে গমন করেন, তবে পাপতাপপূর্ণ সংসার রক্ষা করিবে কে?”

প্রিয়নাথ,—“নিষ্কাম কর্ম্মই যে প্রকৃত সন্ন্যাস, তাহা আমি জানি। তবু আমার মন কি এক অপূর্ণতা বহন করিতেছে। অমরেন্দ্র, মন কোন যুক্তি শুনিতে চাহে না,—হিমালয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। তুমি জগতের কার্য্য কর; আমাকে বিদায় দাও!”

অমরেন্দ্র—“প্রিয়নাথ, তুমি আমার বাহুতে শক্তি! তোমাকে হারাইলে আমার সেই শক্তিই বিনষ্ট হইবে। আমি কাহার বলে কার্য্য করিব? আমাকে কোন্ অপরাধে পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছ?”

প্রিয়নাথ,—“তোমার অপরাধের জন্য নহে। আমার প্রাণ জানি না কেন সংসারে তিষ্ঠিতে চাহে না।”

অমরেন্দ্র অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন,—“প্রিয়নাথ তুমি আমার প্রাণস্বরূপ। তোমাকে ছাড়িয়া আমি কিছুতেই জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইব না।”

প্রিয়নাথ,—কিছুদিন অতীত হইলে নিশ্চয় তুমি আমাকে ভুলিতে পারিবে।"

অমরেন্দ্র,—প্রিয়নাথের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া অশ্রু-বর্ষণ করিয়া কহিলেন,—"প্রিয়নাথ, তুমি আমাকে আজ পর্য্যন্তও চিনিতে পার নাই। তোমাকে হারাইলে আমার জীবন শ্মশানসদৃশ হইবে। সংসারে কিছুই তোমার তুল্য নহে। তুমি আমার কেবল বন্ধু নহ। তুমি স্নেহে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, উপদেষ্টায় গুরু মনোরঞ্জনে সুহৃদ, বিপদে পথ-প্রদর্শক; তুমি আমার অন্ধকারের আলোক। আমাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি বনে গেলে আমি নিশ্চয়ই তোমার অনুগমন করিব। যেস্থানে তোমার বাস সেইস্থানেই আমার স্বর্গ।" অমরেন্দ্রের অশ্রুজলে প্রিয়নাথের বক্ষস্থল সিক্ত হইল।

এ প্রকারে উভয়ে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিতে লাগিলেন। পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র নিস্তব্ধ থাকিয়া সেই দুইটি প্রেমের সুন্দর চিত্র যেন দেখিতে লাগিল। কি মনোহর নীলমণি কাঞ্চনে যোগ! নীল পদ্মে কনক-পদ্ম; মরি মরি কি অপূর্ব্ব মাধুরী।

সেই সময় নীরব ধ্বনিতে অন্তর প্রতিধ্বনিতে করিয়া

প্রিয়নাথের হৃদ্‌পদ্মে একটি বাণী সমুখিত হইল, “কর্ম্মত্যাগে কখনও প্রাণের অপূর্ণতা দূর হইবে না। ভক্তিতেই মুক্তি। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মের মিলনই প্রকৃত শান্তির পথ। ভক্তি ভিন্ন কর্ম্মত্যাগে কোন ফল নাই।”

প্রাণের মধ্যে এ বাণী লোকে বলে বিবেক, প্রিয়নাথ বুঝিলেন, ইহা ঈশ্বরের বাক্য।

তিনি ভাবিতে লাগিবেন,—“এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, এই প্রকার কর্ম্মত্যাগ স্বার্থপরতারই নামান্তর মাত্র। বিশেষতঃ অমরেন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া যাইতে আমি কোনমতেই সমর্থ হইব না। অমরেন্দ্র গেলে প্রফুল্ল কি বাঁচিবে? সাধের গৃহ গঠিত করিতে যাইয়া নিজেই কি তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিব? কে যেন আজ সূর্য্যাস্তের পর আমাকে জানাইয়া গেল, এই যে প্রেম ও আনন্দের মূর্ত্তি অমরেন্দ্ররূপে আমার বক্ষস্থলে রহিয়াছে তাঁহাকে ত্যাগ করিলে, আমার সমস্ত সাধনাই ব্যর্থ হইবে।”

তখন প্রিয়নাথ অমরেন্দ্রকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া কহিলেন,—“ভাই, চিরদিন যে আমি তোমারই।*

---

* লেখিকার ‘অমরেন্দ্র’ নামক উপন্যাস হইতে।

আর্য্যজাতির পতনের কারণ

সে কি শুভদিন! যেদিন সুদূর মধ্যএশিয়ার মরু-প্রান্তর ও নিবিড় শৈলমালা অতিক্রম করিয়া আর্য্যজাতি শস্য শ্যামলা ভারতমাতার স্নেহক্রোড় অলঙ্কৃত করেন, যেদিন মনুষ্যনামধারী শোণিতপিপাসু দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জীব এবং বিহঙ্গকাকলী মুখরিত বনভূমি সেই পিতৃপুরুষদের পদরেণুতে পূততম হইয়া উঠিয়াছিল, সেকি শুভদিন নয়?

সেই স্মরণীয় মাহেন্দ্রক্ষণে যদিও আর্য্যগণ বিপ্লব বাত্যাতাড়নে সিন্ধুনদের নির্ম্মল সলিল আন্দোলিত করিয়াছিলেন, মধুময়ী প্রকৃতিদেবীর পুষ্পাভরণ ছিন্ন-বিছিন্ন হইয়াছিল, শান্তশ্যামকান্তার শোভী তরুলতা গুল্ম বিদলিত করিয়া তাহাদের করধৃত বিজয় বৈজয়ন্তী অনন্ত নীল আকাশে উড্ডীন হইয়াছিল, যদিও অরণিসম্ভূত অগ্নিশিখার ন্যায় বহুঘাত প্রতিঘাতের ও সংঘর্ষণের ফলে তাঁহাদের জাতীয় জীবনরূপ অনল স্ফুলিঙ্গ অর্জ্জিত হইয়াছিল এবং ভারতবর্ষের উর্ব্বরভূমিতে এক মহাশক্তির বীজ তাঁহারা স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা শান্তিরই উপাসক ছিলেন। চিরকল্যাণালয় ভগবৎ চরাণাশ্রিতা শ্রীর সহিত তাঁহারা শান্তিকে ন্যায়ের

মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অবিরাম পরিশ্রম এবং প্রাণপাত দ্বারা যে জাতীয় শক্তির হুতাশন উদ্ভূত তাহা সাম্য মৈত্রী এবং তিতিক্ষার হবির্দ্বারা পবিত্রীকৃত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। ইহাই তাঁহাদের উন্নতির মূল সূত্র। ইহাদ্বারাই তাঁহাদের হোমাগ্নির দীপ্ত-আলোক উজ্জ্বলতর হইয়াছিল।

আর্য্যগণ স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত থাকিলেও কল্যাণ-ময়ী মৈত্রীই তাহাদের অনন্ত উন্নতির তীর্থযাত্রা সুগম করিয়া দিয়াছিল,—এবং কণ্টকাকীর্ণ পথকে অতি কোমল হস্তে পরিস্কৃত করিয়া অসাধ্যসাধনে রত রাখিয়া-ছিল। তাঁহারা জানিতেন, সাম্য ও মৈত্রী ভিন্ন সমাজ-শক্তিরূপ হর্ম্ম্যের ভিত্তি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। তাই তাঁহারা এক হস্তে স্বাধীনতার পতাকা এবং অপর হস্তে প্রীতির সুরভি পুষ্পমাল্য লইয়া কীর্ত্তির মণিমণ্ডিত সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এবং আপনাদের বল অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। এই প্রীতির মন্ত্রেই তাঁহারা সহস্র সহস্র দুর্দ্ধর্ষ অনার্য্যজাতিকে স্ববশে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নতুবা কেবল অস্ত্রবলে কখনই তাঁহারা ভারতবর্ষে একাধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইতেন না।

উদার ধর্ম্ম ভীরুতাই তাহাদের উন্নতির প্রধান ভিত্তি ছিল। যখন তাঁহারা নির্ম্মল সৌন্দর্য্যে অপরিসীম মহাশক্তির পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইতেন, এবং তাহার পূজা করিতেন, তখনও তাঁহাদের অকপট উদার ধর্ম্ম-ভীরুতার পরিচয় পাওয়া যায়।

"হে অগ্নি আমাদিগকে কর্ম্মফল ভোগের দ্বারা সুপথে লইয়া যাও ; হে দেব তুমি সমুদয় কর্ম্ম জ্ঞাত আছ। আমাদের মন হইতে কুটীল পাপ দূর কর। তোমাকে বার বার নমস্কার করি।"

আর্য্যগণ ক্রমে ক্রমে কি প্রকার সাধনার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, আমাদের উপনিষৎ গীতা প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ তাহার সাক্ষীস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুরনন্দন নিবাসিনী দিব্যাঙ্গনার ন্যায় সাম্য মৈত্রী তাঁহাদের সাধন-মন্দির আলোকিত করিয়া প্রীতির বীণার যে মধুর গীতিধ্বনি উত্থিত করিয়াছিল, তাহার প্রতিধ্বনি আজিও কালের গভীর আবরণ ভেদ করিয়া প্রকৃতির মর্ম্মে মর্ম্মে বাজিয়া উঠিতেছে।

মানবসমাজের অর্দ্ধেকই নারীশক্তি, ইহা কাহারো অবিদিত নাই। পুরুষ ও নারীশক্তি সংমিশ্রণে সমাজের পূর্ণতা সাধিত হয় একথা আর্য্যগণ যে সম্যক হৃদয়ঙ্গম

করিয়াছিলেন আমাদের শাস্ত্র ও পুরাণ গ্রন্থগুলি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই নারীশক্তির বিকাশ সাধনই তাঁহাদের উন্নতির অন্যতম কারণ। গুণে জ্ঞানে শৌর্য্যে বীর্য্যে সমাজে নারীচরিত্রের কি প্রকার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল উমাচিত্র তাহার উজ্জ্বলতম আদর্শ।

যেদিন হিমানিমণ্ডিত হিমাদ্রির সুশোভন-কাননে পবিত্র-সলিলা কল্লোনাদিনী মন্দাকিনীতীরে ব্রতধারিণী কুমারী উমা তপস্যা নিরত ছিলেন,—নিদাঘের প্রখর রবিতাপে অনলবেষ্টিতা, প্রাবৃটের অবিরলধারা সেবিতা, শীতঋতুর প্রচণ্ড শীত সহিষ্ণুতা তাহার অপূর্ব্ব তপ প্রভাব পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিল; যেদিন সেই কুমারীমূর্ত্তি গৃহিণী-পদে অভিষিক্তা, পতিপুত্র কন্যা পরিবেষ্টিতা সুগৃহিণী সু-মাতা ও পতিব্রতার আদর্শরূপে মহাযোগীর পাশে যোগিনী বেশে গভীর ধর্ম্মালোচনায় রত, জগজ্জননীরূপে জগতবাসীর হিতরত, আবার যখন সেই কল্যাণদায়িনী মাতৃমূর্ত্তি সংহারিণীবেশে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণা, অবিচার অত্যাচার দমনে করবাণ হস্তে অসুর দলনে নিরতা, সে দিনের কথা স্মরণ করিয়া সেই মহামহিমাময়ী নারীমূর্ত্তি মানসচক্ষে দর্শন করিয়া ভক্তিপ্লুত ভয়ে বিস্ময়ে পরিপ্লুত হই এবং তদানীন্ত আর্য্যসমাজের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ

উপলব্ধি করিতে পারি। যদি কেহ এই দেবীচিত্র কল্পনার বস্তু বলিতে চাহেন তথাপি সমাজের উচ্চ আদর্শের বাস্তবতা স্বীকার করিতে হইবে। বাস্তবের ভিত্তি ভিন্ন কখনও কল্পনা তিষ্ঠিতে পারে না। বেদেও এইরূপ শক্তিশালিনী নারীচিত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদের অনেক শুক্ত যে নারী-রচিত তাহা সুবিদিত। পদ্মাসনা বাণীর পুষ্পোদ্যান হইতে তাঁহারা যে সুরভি পুষ্প চয়ন করিয়া অপূর্ব্ব মাল্য রচনা করিতেন তাহার সৌরভ আজিও বিশ্ব সাহিত্যকে আমোদিত করিতেছে।

আর্য্যগণ নারীকে কি প্রকার শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দর্শন করিতেন অনেক স্মৃতি শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ দর্শন করা যায়। মহর্ষি অত্রি বলিয়াছেন, "চন্দ্র গন্ধর্ব্বগণ ও অঙ্গিরা স্ত্রীদিগকে শুচিতা দান করিয়াছেন এবং অগ্নি সর্ব্ব-শুচিতা দান করিয়াছেন। অতএব স্ত্রী সর্ব্বদাই পবিত্র।"

স্ত্রী জাতি যে সর্ব্বদাই পবিত্রতা এবং নীতির আদর্শ প্রাণপণে রক্ষা করেন মহর্ষি পরাশরও ইহা অস্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন "স্ত্রীজাতি বালিকাই হউক আর বৃদ্ধাই হউক, তাহারা কদাচ অপবিত্র হয় না।"

প্রজাপতি দক্ষ ও সাধ্বী স্ত্রীকে অতিশয় উচ্চে আসন প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "যে স্ত্রী স্বামীর অনুকূলতাচরণ করে ও বাক্যদোষ রহিত, কার্য্য দক্ষা সতী. মিষ্টভাষিণী ও আপনা আপনি ধর্ম্ম রক্ষা করেন এবং পতিভক্তিমতি. সে স্ত্রী মনুষ্য নয় দেবতা সদৃশী।"

আর্য্যগণ যদিও অনার্য্যদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহারা সর্ব্বদাই অনার্য্যদিগকে সখ্য বিবাহাদির দ্বারা প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিতে যত্নবান হইতেন এবং তাহাদিগকে আর্য্য সমাজের অঙ্গীভূত করিয়া লইতেন এই সম্প্রসার নীতিই আর্য্যগণের উন্নতির একটী প্রধান কারণ ছিল এবং তাহাতেই তাঁহাদের শক্তি বিশ্ববিজয়িনী হইয়া উঠিয়াছিল।

অনেক স্থানে নিম্ন শ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগকে তাঁহারা অতি উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছিলেন। শৌনক প্রভৃতি জগৎ পূজ্য মহর্ষিগণ মহাপণ্ডিত ও সূতপুত্র উগ্রশ্রবার নিকট পুরাণ শ্রবণ করিয়াছিলেন। এমন কি শূদ্রগণ ও বেদ রচনায় অধিকারী ছিলেন।

যে আর্য্য জাতি জগতে শ্রেষ্ঠতম শক্তিরূপে পরিগণিত ছিলেন, যে ভারতবর্ষ ধরণী রাণীর মুকুটভূষণ দুর্লভ স্পর্শ-মণিরূপে শোভা পাইত, যাহার স্পর্শে বিশ্ব ভাণ্ডারের কত

কত লৌহ স্বর্ণে পরিণত হইয়াছে কি প্রকারে তাহার এরূপ অধঃপতন ঘটিল ? তাহার হেতু কি ?

জাতি বিদ্বেষই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। যখন ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে উচ্চ ধর্ম্ম সাধনা শিথিল হইয়া আসিতেছিল যোগ, জ্ঞান ভক্তির সাধন কতকগুলি লৌকিক আচার নিয়মে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, সেই সময়ে জাতিবিদ্বেষ সমাজ বক্ষের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া বিষ কীটের ন্যায় তাহাকে দংশন করিতে প্রবৃত্ত হইল। যে মহাপুরুষগণ নিম্ন শ্রেণীস্থ কোনও কোনও ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণেরও শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছিলেন, উত্তর কালে তাঁহাদের বংশধরগণ নিম্ন জাতীয় ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে কি প্রকার অনুশাসন প্রচলিত করিলেন তাহা স্মরণ করিতেও শরীর শিহরিয়া ওঠে।

ঋষিগণের নিকট পুরাণ পাঠক সূত পুত্র উগ্রশ্রবার বিষয় ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কুরুসভায় সমাগত শ্রীকৃষ্ণ সমাজের মুকুট ভূষণ বহু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে উপেক্ষা করিয়া শূদ্রী-গর্ভ-সম্ভূত বিদুরকে কিরূপ সম্মানিত করিয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

যেদিন হইতে আর্য্যসমাজ জাতিবিদ্বেষের লৌহ-প্রাচীরে অবরুদ্ধ হইয়া কোটী কোটী নিম্নজাতীয় ভারত-

সন্তান হইতে পৃথক হইয়া পড়িলেন যেদিন অহমিকার কুজ্ঝটিকায় প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল সেদিন জাতীয় উন্নতির সুবিশাল দুর্গের ভিত্তিমূল—যাহা সহস্র সহস্র বৎসরের কঠোর সাধনায় গঠিত হইয়াছিল তাহা প্রবল ভূকম্পনে কম্পিত হইয়া উঠিল। আবার যেদিন নারীশক্তি উপেক্ষিত হইল নারীকে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় অবরুদ্ধ রাখিয়া মনুষ্যের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল, শিক্ষার পথ তাহাদের নিকট অবরুদ্ধ হইল, সেদিন ভারতের উন্নতির সমুচ্চ প্রাসাদ সকল একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব

সৌন্দর্য্য, তুমি স্বর্গের দূত—দুঃখীর সান্ত্বনা। তুমিই প্রকৃতি-মন্দিরের দ্বার মুক্ত করিয়া জগদতীত বার্ত্তা আমাদের নিকট আনয়ন কর। স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মাঝ-খানে যে যবনিকা চির-কল্যাণকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে, তোমারই প্রেম-হস্ত সেই মায়া-আবরণ আমাদের চক্ষুর নিকট হইতে অপসারিত করে। তুমি কত অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি, কত বধিরকে শ্রবণ-জ্ঞান দিয়াছ। তোমার স্পর্শে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত—মরুভূমিতে নির্ম্মল উৎস উৎসারিত হইয়া উঠে। তুমি কত ওমর, পল, কত জগাই মাধাইকে অপার্থিব জ্যোতিতে মণ্ডিত করিয়াছ। হে সৌন্দর্য্য, তোমায় কত রূপে ভিতরে বাহিরে দেখিতেছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও তোমার তত্ত্ব জানিতে পারিলাম না।

যখন বৈজয়ন্তের অস্ফুটন্ত মুকুলের মত কোন্ অজ্ঞাত রাজ্য হইতে সমাগত একটি ক্ষুদ্র জীব প্রথম বসুন্ধরার অঙ্ক অলঙ্কৃত করে,—জননীর হৃদয় আনন্দ-রসে উচ্ছ্বসিত করিয়া তোলে; তখন লোক-কোলাহলময়ী কর্ম্মভূমিতে সেই নবাগত যাত্রীটির নয়নপথে সর্ব্বাগ্রে কোন্ বস্তু

পতিত হয় ?—সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্যই বিশ্বরাজ্যের সহিত তাহাকে ধীরে ধীরে পরিচিত করিতে থাকে, এবং শিশু-হৃদয়ের সুপ্ত জ্ঞান ক্রমেই বিকশিত হইয়া উঠে। সহস্র অনুভূতির সঙ্গে সৌন্দর্য্য-বোধও তাহার প্রাণে ক্রমে জাগ্রত হয়। যখন সে কাঁদিতে থাকে, একখানি সুন্দর ছবি অথবা একখানি সুন্দর খেলেনা দেখিয়া সে আবার হাসিয়া উঠে। কোন্ বস্তু তাহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর? মায়ের স্নেহ-স্পর্শ,কিংবা মায়ের স্নেহপূর্ণ মুখ! যে নারীকে কুৎসিত কুরূপা বলিয়া জগৎ ঘৃণার চক্ষে দর্শন করে, ক্রোড়স্থিত শিশুর নিকট তাহার মুখখানিও কত সুন্দর! এ সৌন্দর্য্যবোধ কে আনয়ন করিল ?—প্রেম। যে জন্মান্ধ,—চিরদৃষ্টিহীন, প্রেমনয়নেই সে যাকে দেখিয়া লয়,—জগতের নিকট পরিচিত হয়। প্রেম ভিতরে থাকিয়া দৃষ্টিহীনের নিকট যে সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তোলে, বাহিরের দৃষ্টিশক্তি তাহার কাছে কোন্ ছার।

কত যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, প্রকৃতি একই ভাবে শোভা পাইয়া থাকে, একই সূর্য্য নিত্য প্রাচী উজ্জ্বল করিয়া হাসিয়া উঠে,—একই বৃক্ষ লতা পল্লব বনভূমিকে

সুসজ্জিত করে,—নিত্য একই তটিনী অনিল-প্রবাহে তরঙ্গভঙ্গে ছুটিয়া যায়,—সন্ধ্যার রক্তিম আভায় ধরণীকে রঞ্জিত করিয়া রবি অস্তাচল চূড়ায় অদৃশ্য হয়। নিত্য একই ভাবে রূপসী অপ্সরার মত নক্ষত্রকুল রূপের আভায় বিশ্ব মোহিত করিয়া যেন অন্তরের কপাট খুলিয়া হাসিয়া উঠে। নিত্যই চন্দ্রমা রজত-চন্দ্রিকা-লহরে ধরণীকে ভূষিত করে। প্রকৃতি-রাণীর প্রতি অঙ্গের ভুবনমোহিনী মাধুরী একই রূপে কত কাল ধরিয়া দেখিতেছি; কই, দেখিয়া তো সাধ মিটে না, আঁখি পরিতৃপ্ত হয় না। ঐ সৌন্দর্য্য-বিভব যেন নিত্যই নূতন। প্রেমই পুরাতনে নূতনত্ব দান করে। কারণ প্রেম স্বয়ং চৈতন্যময়ী মহাশক্তিরই চিরন্তন সৌন্দর্য্য।

প্রেমই প্রাণে সৌন্দর্য্য-বোধ জাগ্রত করে; সেই প্রেম দুই মূর্ত্তিতে জগতে দর্শন করা যায়; স্বভাব-বিকশিত এবং সাধন-বিকশিত।

শিশু মাকে ভালবাসে, একটু না দেখিলেই মা মা বলিয়া কাঁদিয়া অস্থির হয়। সংসারের সঙ্গে যাহার অল্পই পরিচয় জন্মিয়াছে, যে অস্ফুট হৃদয়ে জ্ঞানের কিছু-মাত্র বিকাশ নাই, সে এত ভালবাসা কোথা হইতে লাভ করিল? তাহার প্রেম স্বভাবে জন্মিয়া স্বভাব

দ্বারাই ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। সন্তানের প্রতি মাতার যে নিঃস্বার্থ স্নেহ তাহাও এই শ্রেণীর। যিনি মাতৃবক্ষে স্তন্য-সুধা দান করিয়াছেন, তাঁহারই করুণায় মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহ অমৃত-ধারার ন্যায় প্রবাহিত হইয়া বিমল প্রবাহে জীবলোক পবিত্র ও প্লাবিত করিতেছে। এই স্বভাব-বিকশিত প্রেমই বিশ্ব প্রকৃতিতে অতি পরিস্ফুট রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই অলক্ষ্য সঞ্জীবন মন্ত্রে প্রাণীজগৎ বর্দ্ধিত ও রক্ষিত হইতেছে। পাখীটি বনে বনে ঘুরিয়া শাবকের জন্য আহার সংগ্রহ করিতেছে,—নিজে ঝড়বৃষ্টি সহ্য করিয়া পক্ষপুটে সন্তানকে ঢাকিয়া রাখিতেছে। পশু আহার নিদ্রা ভুলিয়া কত যত্নে সন্তান পালন করিতেছে। কীট পতঙ্গেও এই প্রেম বিদ্যমান। কোন কোন ইতরপ্রাণীকে সন্তানের জন্য নিজ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে দেখা যায়। মানব-মাতার কথা আর কি বলিব? প্রকৃতি যেন জগদ্ধাত্রী বেশে সকল জীবকেই আপনার স্নেহবক্ষে টানিয়া লইয়াছেন। এই প্রেমে যে সৌন্দর্য্য-বোধ, তাহাও প্রকৃতি প্রদত্ত। যে নিগ্রো-শিশুকে শ্বেতকায় ব্যক্তি ঘৃণার চক্ষে দর্শন করেন, সেই কৃষ্ণকায় বালকও নিজ জননীর নিকট কত সুন্দর! তাহার প্রতি কথা,

প্রতি অঙ্গভঙ্গী, হাসি, কান্না, খেলা, মাতার চক্ষে কত সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দেয়! যে বৃক্ষটি আমি যত্নে রোপণ করি—তাহাতে সতত জল সেচন করি, অন্যের নিকট না হউক, সে বৃক্ষ আমার নিকট কত সুন্দর।

যে প্রেমের উন্মেষ সাধনসাপেক্ষ, তাহার নামই সাধন-বিকশিত প্রেম। যে স্বর্গের ধনে মনুষ্যের জন্ম সার্থক হয়, জগৎ আনন্দময় হইয়া উঠে, তাহা কখনও সাধনা ভিন্ন লাভ হইতে পারে না।

সমুদ্র নীল দিগন্তকে আলিঙ্গন করিয়া অনন্তপ্রবাহে শোভা পাইতেছে; সর্ব্বত হিমানীমণ্ডিত বেশে শুভ্র-জটাজুট-ধারী যোগীর ন্যায় বিরাজ করিতেছে; কত ফুল বনে ফুটিয়া উঠিয়া মাধুরী ঢালিতেছে; লতা তরুর শ্যাম অঙ্গে বায়ু-হিল্লোলে দুলিয়া দুলিয়া যেন সৌন্দর্য্য ছড়াইতেছে। পাখীর কলকণ্ঠে, ভ্রমর-গুঞ্জনে, ঝিল্লীর নিশীথ-গীতি-ধ্বনিতে কত মাধুর্য্য! এ সকল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কি সকলে সমান ভাবে অনুভব করিতে সমর্থ হয়? কবি, ভাবুক ও ভক্তের প্রাণে যেমন সৌন্দর্য্যের অনুভূতি, সাধারণের পক্ষে তাহা কখনও সম্ভবপর নহে। এই প্রেম, যদিও স্বভাব হইতেই জন্মে, তথাপি সাধন ভিন্ন তাহা বিকশিত হইতে পারে না।

জ্ঞান আমাদের নিকট কেবল বস্তু-তত্ত্বই নির্ণয় করিয়া থাকে। সুদূরস্থ নীহারিকা-পুঞ্জে নক্ষত্রে নক্ষত্রে, গ্রহে গ্রহে ভ্রমণ করিয়া বিজ্ঞান সৃষ্টিতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতেছে। মহাসমুদ্রের অতল গর্ভে প্রবেশ করিয়া কোথায় কোন্ পদার্থ, কোন্ রত্ন নিহিত রহিয়াছে, তাহা জ্ঞাপন করিতেছে, ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া পৃথিবীর জন্মকাল নির্ণয় করিতেছে; কিন্তু তাহাকে সৌন্দর্য্যে শোভিত-করা—ভাব-সম্পদে ভূষিত করা, জ্ঞানের সাধ্য নয়; প্রেমেই কেবল এই দুর্জ্জেয় সৃষ্টিলীলাকে সৌন্দর্য্যে মহিমাময়ী করিয়া তুলিয়াছে। কবি, ভাবুক, ভক্তের নিকট বিজ্ঞানের জটীল রহস্যও কত মাধুর্য্যময়!

ইটালীর সুসন্তান কবিবর দান্তে বলিয়াছেন, মানব-হৃদয় প্রেমে সুন্দর না হইলে তাহা হইতে কবিতার উৎপত্তি হইতে পারে না। প্রেম স্বয়ং বিশ্বাতীত এবং সৌন্দর্য্যের সার। আর্য্য কবিগণ তাঁহাদের অতুলনীয় তুলিকায় প্রেমের মাধুরী বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন।

প্রেম সত্য সত্যই সুন্দর। কিন্তু এই মর্ত্ত্যলোকে প্রেমের সৌন্দর্য্য কোথায় মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে?—নারীচরিত্রে। পৃথিবীর কাব্য ইতিহাস এইরূপ শতশত জীবন্ত নারী-চিত্রে পূর্ণ রহিয়াছে।

ঐ যে ঋষি-প্রতিপালিতা তরুণী কুটীর দ্বারে উপবিষ্টা! প্রেমের এক গভীর সাধনায় তাঁহার প্রাণ নিমগ্ন। বাহিরের কোন দর্শনীয় বস্তু তাঁহার নয়ন দেখিতেছে না,—কর্ণ কোন শব্দই শ্রবণ করিতেছে না, এই বাহ্য-জগৎ যেন তাঁহার হৃদয়ে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। একখানি সুন্দর মুখ মানসপটে উদিত হইয়া তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন করিয়াছে। তিনি একেবারে প্রিয়তমে তন্ময়তা লাভ করিয়াছেন। এমন সময় সাক্ষাৎ জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় মহর্ষি দুর্ব্বাসা নিকটে সমুপস্থিত হইয়া সদর্পে গর্জ্জন করিয়া কহিলেন,—

"দ্বারে অতিথি সমাগত—দুর্ব্বাসা অতিথি।"

কিন্তু এই জলদ-নির্ঘোষে তাপসীর তপস্যা ভঙ্গ হইল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রিয়-ধ্যাননিরতা তরুণীর মস্তকে ঘোররবে বজ্রপাত হইল। তথাপি সেই নবীনা তপস্বিনীর ধ্যান ভঙ্গ হইল না।

এই মনোরম জীবন্ত চিত্রটি দেখিতে দেখিতে প্রাণ আপনা আপনি বলিয়া উঠে,—কি সুন্দর! কি সুন্দর!

আর একটি বিচিত্র চিত্র,—ভারতের গিরি-নিকেতনে এক রমণীয় তপোবন। শ্যামল তরুগুল্ম ও ফলে ফুলে তাহা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। পাদপ্রান্তে স্বচ্ছ-

সলিলা স্রোতস্বিনী প্রস্তররাশি ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই মনোজ্ঞ স্থানে পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি রূপে বিরাজিত থাকিয়া বেদবতী তপস্যা করিতেছেন। তাঁহার রূপরাশি তপঃপ্রভাবে হোমাগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে! আত্মীয় স্বজনের স্নেহ, সমস্ত ভোগ-বাসনা ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রাণ কোন্ সৌন্দর্য্যে মগ্ন রহিয়াছে?

বেদবতী ধ্যানান্তে জপে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন, এমন সময় লঙ্কা-অধিপতি রাবণ ত্রিলোক জয় করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল।

একাকিনী অরক্ষিতা নারীকে সেখানে তপস্যায় রত দেখিয়া রাক্ষস-নাথ রাবণ কহিল,—

"দেবী, তুমি কে? তোমার এই অলৌকিক রূপ কখনও তপস্যার উপযুক্ত নহে। তুমি আমার মহিষীরই যোগ্যা। আমি দেবতাদিগের অধীশ্বর।"

বেদবতী কহিলেন—"রাক্ষস, তোমার মঙ্গল হউক, আমি বিষ্ণুকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি। এই নির্জ্জন অরণ্যে ভগবানই আমার একমাত্র রক্ষক। তিনিই অবলার বল।"

রাবণ দেখিল, এইরূপ অসহায়া ক্ষীণাঙ্গী নারীকে

হরণ করা তাহার মত বলশালী বীরের পক্ষে কিছুমাত্র আয়াস-সাধ্য নয়। বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কি? এই ভাবিয়া সে দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস দুইপদ অগ্রসর হইয়া বেদবতীর কেশাগ্র ধারণ করিল। কিন্তু দুর্জ্জয় দৈব-বলের নিকট পাশব-বল পরাস্ত হইল। সহসা সেই লাবণ্যময়ী তরুণীর কান্তি আশ্চর্য্য ব্রহ্মতেজে দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং প্রবল পরাক্রান্ত দশাননকে ভীত ও স্তম্ভিত করিয়া ফেলিল।

বেদবতী কহিলেন,—"দুরাচার, কেশ স্পর্শ করিয়া আমার দেহ অশুচি করিয়াছিস্। আমি অগ্নিতে এই দেহ আহুতি প্রদান করিয়া মৃত্যুর পর প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হইব।"

এই বলিয়া সেই জ্যোতির্ম্ময়ী নারী সমীপস্থ যজ্ঞীয় অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। সর্ব্বভুক্ হুতাশন দেখিতে দেখিতে বেদবতীর কমনীয় দেহ ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। প্রেম, পবিত্রতা ও আত্মোৎসর্গের কি জীবন্ত সৌন্দর্য্য!

সত্য সত্যই নারী ধর্ম্মের রক্ষয়িত্রী। নারী যদি প্রেমের অমৃত-রসে ধরণীকে সঞ্জীবিত না করিতেন, তবে জন-সমাজ মরুভূমিতে পরিণত হইত! স্নেহময়ী

জননীরূপে, সেবাপরায়ণা দুহিতারূপে, অনুরাগের প্রস্রবণ দয়িতারূপে, নারীকে দেখিতে পাই। কি ধনীর রম্য হর্ম্ম্য, কি দরিদ্রের পর্ণকুটীর, কি নগর, কি গ্রাম, কি বন, সর্ব্বত্রই নারীর পবিত্র সেবা-হস্ত; সকল স্থানই নারী-প্রেমের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইয়া রহিয়াছে!

এই সৌন্দর্য্য বিশ্ব-প্রেমে উজ্জ্বল হইয়া উঠিলে তাহা প্রকৃতই অতুল্য। ভগবদ্ভক্তিতে তাহার পূর্ণতা সম্পাদিত হয়।

যখন মহর্ষি ঈশা ক্রুশে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন,—সেই, শান্ত সমাহিত কান্তি শোণিতস্রোতে প্লাবিত হইয়া যাইতেছিল, তথাপি মহর্ষির মুখ বিশ্ব-প্রেমে সমুজ্জ্বল, তিনি হত্যাকারীর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিতেছিলেন! আর যখন নবদ্বীপের পথে নিত্যানন্দ জগাই মাধাই কর্ত্তৃক আহত ও রক্তধারায় প্লাবিত হইয়া আনন্দ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিতেছিলেন—

"মেরেছিস্ কলসীর কানা,
তা বলে কি প্রেম দেব না?"

এবং তাহাদিগকে ভাই বলিয়া প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তখন এই পৃথিবীতে

বিশ্ব-প্রেমের যে সৌন্দর্য্য দেব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার তুলনা মিলে কি ?

সকল সৌন্দর্য্যের আধার সেই অনন্ত প্রেম-প্রস্রবণের একটি ধারা মর্ত্ত্যলোক প্লাবিত করিতেছে। সাধনা দ্বারা ভক্তগণ তাহা লাভ করিয়া থাকেন, তাই, প্রেমিক ভক্তের হৃদয় এত সুন্দর! এই প্রেম-ধারার নামই পরানন্দ বা চিদানন্দ ঘন।

কত তাপস তপস্বিনী নির্জ্জন গিরি-কন্দরে, পূত-সলিলা তটিনী-পুলিনে সেই আনন্দ স্বরূপের ধ্যানে যুগযুগান্তর অতিবাহিত করিয়াছেন তাঁহারা সেই দেব-দেবকে "রসো বৈ সঃ" রূপে ঘোষণা করিয়াছেন।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চ নেতি"
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।

"মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে ফিরিয়া আইসে সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানেন তিনি কোন বস্তু হইতে ভয় প্রাপ্ত হন না।"

যিনি বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের প্রাণ,—সাধক যাঁহাকে "শিব সুন্দর" রূপে ভজনা করেন, বৈষ্ণব কবি যাঁহার হ্লাদিনী শক্তিতে মোহিত হইয়াছেন, তাঁহাতে প্রাণ

সমর্পণ করিলেই মানুষ সৌন্দর্য্যের সারতত্ত্ব বুঝিতে পারেন।

"সচ্চিৎ-আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ,
অতএব স্বরূপ-শক্তিতে তিন রূপ।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী,
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি,
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম,
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের লক্ষণ।"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের আনন্দেই সৃষ্টির সৌন্দর্য্য নিহিত রহিয়াছে। এজন্যই উপনিষৎকার ঋষিগণ তাঁহাকে "রসস্বরূপ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভগবানের এই আনন্দস্বরূপই হ্লাদিনীশক্তি; হ্লাদিনীশক্তিই বিশ্বলীলায় বিকশিত হইয়া সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে। তাহার নামই প্রেম। এই প্রেম চির সুন্দর, চির নূতন,—চির মঙ্গলময়। ইহার রূপ-মাধুরীতে চিরদিন জগৎ মোহিত। সৌন্দর্য্যের ইহাই সার-তত্ত্ব।
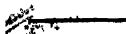
জ্ঞান

জ্ঞান আত্মার আলোক। যেমন সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার বিনষ্ট হয়, আনন্দময়ী ভুবনমোহিনী উষার কণক-কিরণে জগৎ রঞ্জিত হইয়া ওঠে, তেমনই আত্মাতে জ্ঞানের উজ্জ্বল নির্ম্মল কিরণ উদ্ভাসিত হইলে মোহতমঃ দূরীভূত হয়। দেবমন্দীরের প্রভাত মঙ্গল শঙ্খধ্বনির ন্যায় জ্ঞান ধীরে—ধীরে, অতি ধীরে হৃদয়দ্বারে প্রবেশ করিয়া মানবাত্মাকে সচেতন করিয়া তোলে। সে মঙ্গলময় চৈতন্যময় আহ্বানধ্বনিতে মর্ম্মতন্ত্রীর প্রতি তার কি এক অজ্ঞাত-সুরে বাজিতে থাকে,—প্রতি শিরা ধমনীর প্রতি রক্ত-বিন্দু সজাগ হইয়া ওঠে। জ্ঞান কলুষ-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার তরণীস্বরূপ। একথা পৃথিবীর সমস্ত সাধক ভক্ত একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। গীতা বলিয়াছেন,—

"যদি সমুদায় পাপী হইতেও তুমি অধিক পাপকারী হও, তথাপি সমুদায় পাপ-সমুদ্র জ্ঞানালোক দ্বারাই সম্যকরূপে উত্তীর্ণ হইবে।"

জ্ঞান, ভক্তি কর্ম্ম, আত্মার তিনটি অবস্থামাত্র। যোগী সাধকদিগের জীবনে ইহাদের আশ্চর্য্য সংমিশ্রণ

ও সামঞ্জস্য দর্শন করা যায়। যেমন একটি বীণাযন্ত্রের তিনটি তার তানলয় যোগে মধুর নিস্বন তুলিয়া সমান-ভাবে বাজিতে থাকে, তেমনই ভক্ত হৃদয়ে জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মের চমৎকার সমতা দর্শন করিয়া আমরা মুগ্ধ হই। মূলতঃ বিভিন্নতা সত্ত্বেও কেমন অপূর্ব্ব একত্ব! যেমন তিনটি স্রোতস্বিনী একত্র মিলিত হইয়া একই তরঙ্গ তুলিয়া মহাসাগরে গমন করে, তেমই যখন জীব হৃদয়ে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম পরস্পর সম্মিলিত হইয়া অনন্ত প্রেমসিন্ধুর উদ্দেশে ধাবিত হয়, তখন তাহাদের প্রভেদ কোথায়? সে মধুময় সম্মিলনে কতই মাধুরী কতই মহিমা প্রকাশিত হইয়া জগৎকে ধন্য করে।

সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ভগবানের এই তিনটি স্বরূপ সাধনাতে সাধক হৃদয়ে জ্ঞান ভক্তি, কর্ম্মের বিকাশ হইয়া থাকে।

"কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
সর্ব্বাদি সর্ব্ব অংশী কিশোর শেখর।
চিদানন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর॥
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—শ্রীচৈতন্যের উক্তি, মধ্যমখণ্ড সনাতন শিক্ষা।

"এক অখণ্ড অব্যয় জ্ঞান বস্তুকেই তত্ত্ব বলা যায়। তিনি শুদ্ধ আনন্দ চিন্ময়। তিনিই সৃষ্টাদির আদিকারণ। তাঁহার তুল্য কেহ নাই, তাঁহার শ্রেষ্ঠও কেহ নাই। আমি তাঁহাকেই ব্রজের, ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছি। এই তত্ত্ব বস্তুর অনন্ত প্রকাশের মধ্যে তিনটি প্রকাশ আছে। ব্রহ্ম আত্মা ভগবান তিনটি পৃথক বস্তু নহে, একই বস্তুর তিনটি প্রকাশ মাত্র। ব্রহ্মস্বরূপ নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময়। অনন্ত বিশ্বসৃষ্টিতে যে জ্যোতি প্রকাশিত তাহা ব্রহ্ম-জ্যোতির ছায়া মাত্র। দ্বিতীয় পরমাত্মা, ইনি চৈতন্যময় অন্তর্য্যামী আত্মারাম, অন্তরতর অন্তরতম। হিরণ্ময়ে পরে কোষে ইঁহাকে ধ্যান করিয়া যোগীগন যুগ যুগান্ত কাটাইয়া দেন। তৃতীয় ভগবান্ ইনি লীলা বিগ্রহ। নর লীলায় মানব ইতিবৃত্তে তাঁহার দর্শন হইতে পারে।"

ভাষ্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

"ব্রহ্ম" ও "আত্মার" সাধনায় কেবল জ্ঞানের বিকাশ। "ভগবৎ" তত্ত্বের সাধনায় জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম তিনেরই বিকাশ হইয়া থাকে। এই ভগবৎ তত্ত্বই সচ্চিদানন্দ মানবের বিচিত্র কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার পূজা। সচ্চিদানন্দ

স্বরূপ ভগবানের যে অনন্ত জ্ঞানের কণিকামাত্র আশ্রয় করিয়া জীবগণ তাঁহার দিকে অগ্রসর হয় আমরা তাহার সম্বন্ধেই দুই একটি কথা বলিব।

এই বিবিধ লীলাপূর্ণ কার্য্য কারণ সূত্রে নিয়ন্ত্রিত সৃষ্টি বৈচিত্র্যে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অনুধ্যান করিলেই আমরা সর্ব্বপ্রথমে কি অনুভব করি? ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, পালনতত্ত্ব—প্রাকৃতিক অলঙ্ঘনীয় বিধান পরম্পরা নীরব ধ্বনিতে কি জ্ঞানের মহিমা ঘোষণা করিতেছে না? বিশ্বপ্রকৃতির বিরাট কাব্যগ্রন্থ হইতে প্রতি ছত্রে ছত্রে প্রতি অক্ষরে অক্ষরে অনন্ত জ্ঞানের অমৃত নিস্যন্দিনী ভাষা আমাদের প্রাণের কাছে কি এক বিহ্বলতা আনিয়া দেয় না? এই সমস্ত দর্শন করিয়া স্বভাবতঃই জ্ঞানের স্বরূপ কি এই প্রশ্ন মানব প্রাণে সমুদিত হইয়া থাকে। ঘেরণ্ড সংহিতায় আছে,—

"যে প্রকার মায়ার সমান বন্ধন নাই, এবং জ্ঞানের তুল্য বন্ধু নাই, এবং অহঙ্কারের সমান শত্রু নাই, সেই প্রকার যোগের তুল্য বল আর দৃষ্টি হয় না।"

জ্ঞান কি? এসংসারে সর্ব্বদাই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, বিবিধ ভাষায় কৃতবিদ্য, বহু গ্রন্থ অধ্যয়নকারী ব্যক্তিগণও বিষয়ক্ষেত্রে নানাপ্রকার

দুষ্ক্রিয়ায় রত রহিয়াছেন। গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া তাঁহাদের মোহতমঃ বিনষ্ট হওয়া দূরে থাকুক বরং তাঁহারা দিন দিনই মোহকূপে অধিকতর নিমগ্ন হইতেছেন। সুতরাং আমরা প্রত্যক্ষই দেখিতেছি অধ্যয়ন আলোচনা প্রভৃতি দ্বারা তাঁহারা জ্ঞানের আলো এক কণাও লাভ করিতে সমর্থ নহেন। পক্ষান্তরে বিদ্যা বুদ্ধি বিহীন নিতান্ত বর্ণজ্ঞানশূণ্য দুই একটি লোক দেখা যায় যাহাদের মধ্যে তত্ত্ব জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক প্রকাশিত হইয়া থাকে। যাহা দ্বারা অসৎ বস্তু হইতে সৎ বস্তু পৃথক প্রতিপন্ন হয় তাহাই জ্ঞান। যদিও সমস্তই সেই সদ্ বস্তু হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, তথাপি সেই সত্য স্বরূপ ব্রহ্ম সমস্ত অসদ্ বস্তু হইতে ভিন্ন। তিনি সমস্ত পদার্থের প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও স্বয়ং স্বতন্ত্র। এই তথ্য জ্ঞানই আমাদের প্রাণের নিকট প্রকাশিত করে। "তাঁহাকে লাভ করিলেই জীবের মানব জন্মের সফলতা" এই সত্যও আমরা প্রথমে জ্ঞানের নিকট শ্রবণ করি। ব্রহ্মের স্বরূপ কি ; আত্মার স্বরূপ কি ? এ সকল তত্ত্বও জ্ঞানই আমাদের নিকট বিদিত করে।

মুণ্ডক্যোপনিসদে আছে,—"তিনি তাঁহাকে বলিলেন।

ব্রহ্মবিদেরা বলেন দুই বিদ্যা জ্ঞাতব্য, পরা (বিদ্যা) ও অপরা (বিদ্যা)।

ইহাদের মধ্যে ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ, সামবেদ অথর্ব্ব-বেদ, শিক্ষা (অর্থাৎ উচ্চারণাদিবোধক বেদাঙ্গ) কল্প (অর্থাৎ বৈদিক ক্রিয়া কল্পবোধক বেদাঙ্গ) ব্যাকরণ, নিরুক্ত (অর্থাৎ বেদ ব্যাখ্যার নিয়মাদিবোধক বেদাঙ্গ) ছন্দ ও জ্যোতিষ ইহারা অপরা (বিদ্যা), পক্ষান্তরে যদ্দারা সেই অক্ষয় পুরুষকে জানা যায় তাহাই পরা (বিদ্যা)।"

এই পরা বিদ্যাই জ্ঞান।

"জ্ঞান কোথা হইতে লব্ধ হয়? আত্মানাত্ম অর্থাৎ চিৎ ও জড় এই উভয়ের স্বরূপ নির্ণয় হইতে।"

শিব সংহিতায় লিখিত আছে,—"জ্ঞানের সঞ্চার হইলেই কাম ক্রোধাদি সকল বৃত্তি বিনষ্ট হয়, তদ্ভিন্ন কোন রূপেই তাহা হইতে পারে না। বস্তুতঃ যৎকালে সকল তত্ত্বের অভাব হয় (অর্থাৎ সংসারাসক্তি দূর হয়) তখনই আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে।" ৫৮।

বিবেক চূড়ামণিতেও এইরূপ উক্তি আছে, —"পণ্ডিত ব্যক্তি এইরূপে সৎ ও অসৎ বস্তু বিভাগ করিয়া আত্মজ্ঞান দ্বারা তত্ত্ব নিশ্চয় পূর্ব্বক অখণ্ড বোধ স্বরূপ আত্মাকে

জানিয়া স্বয়ংই তত্তৎ বিকার হইতে বিমুক্ত হইয়া শান্তি লাভ করেন।”

অষ্টাবক্র সংহিতা ও ঠিক এই কথাই বলেন,—“তুমি যদি এই শরীরকে আত্মা হইতে বিভিন্ন বোধ করিয়া সেই চিৎস্বরূপে অবস্থান করিতে পার তবে এখনই সুখী, শান্ত ও বন্ধমুক্ত হইতে পারিবে।”

গীতা বলিয়াছেন,—“শ্রদ্ধাবান, তৎপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন, জ্ঞান লাভ করিয়া অতি শীঘ্র মোক্ষ প্রাপ্ত হন।”

এক্ষণে দেখা গেল তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিলে কোন ফল নাই। তাহাতে কিছুমাত্র অজ্ঞানতা বিনষ্ট হয় না। হৃদয় মধ্যে সেই পরা বিদ্যার যে উন্মেষ—জীবাত্মার মোহ নিদ্রার সুপ্তি হইতে যে জাগরণ—অনন্ত বিষয় বাসনাতে অচৈতন্য আত্মার যে চিদ্‌বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষার চেতনা তাহার নামই জ্ঞান।

হিন্দুসমাজে ভগবতী পূজার নিমিত্ত প্রথম উদ্বোধন আবশ্যক। নতুবা পূজা হয় না। ইহাদ্বারা আমরা এক চমৎকার শিক্ষা লাভ করিয়া থাকি। আমাদের আত্মাও তত্ত্বজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ না হইলে ব্রহ্মপূজা অসম্ভব। তত্ত্ব-জ্ঞানের ভিত্তির উপর ভক্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে

সাধন ভজন, যোগ তপস্যা সমস্তই মিথ্যা। আত্মার জাগরণ চাই। চিৎস্বরূপেই উদ্বোধন চাই। নতুবা পূজা করিবে কে? এই জন্যই মহাজনেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, ধর্ম্মের ভিত্তি জ্ঞান।

মানবাত্মাতে জ্ঞানের বিকাশের জন্য সাধনার প্রয়োজন। যে অবস্থার ভিতর দিয়া অর্থাৎ যে প্রকার সাধন মার্গের সোপান অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ সত্ব নির্ম্মল জ্ঞানের পূর্ণ বিকশিত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম জ্ঞানযোগ। ইহা জীবাত্মার সর্ব্বপ্রথম সাধন পথ। ইহার উপর ভক্তিযোগ এবং কর্ম্মযোগ স্থাপিত।

জ্ঞানযোগ যে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার নাম "স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান"। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান কি? যাহা স্বয়ং প্রাণে প্রতিভাত হয়। যে জ্ঞান বীজরূপে মানব প্রাণে নিহিত রহিয়াছে। যে প্রত্যয় কোন গ্রন্থ বা গুরুর অপেক্ষা রাখে না। এই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানই মানবের সমস্ত তপস্যার মূল। যিনি আমাদের জন্মের পূর্ব্বে জননীর বক্ষে ক্ষীর প্রদান করিয়াছেন, ক্ষেত্রে শস্য এবং বৃক্ষে ফল সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য মানবের অন্তরে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানকে বীজ রূপে স্থাপন করিয়াছেন। ইহাই জীবের প্রতি ভগবানের

সর্ব্বপ্রধান কৃপা। কে প্রাণের ভিতর গম্ভীর নীরব ভাষায় বলিতে থাকেন—"ঈশ্বর আছেন!" এই প্রকার নির্ব্বাক ধ্বনি প্রাণের অন্তস্তল হইতে নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে। জগতে এমন কে দুষ্কৃতিকারী আছে, যাহার প্রাণ হইতে একবারও দুষ্কার্য্যের প্রতিবাদ উত্থিত হয় না? এমন কে নাস্তিক আছে যে আপনার সৃষ্টিকর্ত্তাকে অস্বীকার করিবার সময় একবারও তাহার প্রাণ কাঁপিয়া ওঠে না? এই স্বভাবসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়কে কাহারও অস্বীকার করিবার সাধ্য নাই।

এই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানকে ভক্তসাধকগণ ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। ঘড়ির কাঁটা যেমন সর্ব্বদা টক্ টক্ শব্দ করিতেছে, দিন নাই, রাত্রি নাই অবিরাম অবিশ্রাম কেবল টক্ টক্ শব্দ। তেমনই মানবের প্রাণের প্রাণে, অন্তরের অন্তরে বসিয়া একজন দিন রাত্রি অবিশ্রাম শব্দ করিয়া জানাইতেছেন "এটি ভাল, এটি মন্দ" "এটি ভাল, এটি মন্দ" "আমি আছি" "আমি আছি"। নীরব ভাষায় নিরন্তর এই বাণী উত্থিত হইতেছে। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য কোন যুক্তি তর্কের আবশ্যক হয় না। ইহাকে লোকে বলে বিবেক, কিন্তু ইহা ভগবানের সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ।

জল, বায়ু, আলোক যেমন স্বাভাবিক ও সহজ প্রাপ্য, ধর্ম্মও তেমনি স্বাভাবিক। সকলের প্রাণ হইতেই এই প্রকার ধ্বনি অবিশ্রাম উঠিতেছে।

তবে কেন সকলে নিজের প্রাণে প্রত্যাদেশ শুনিতে পায় না? আত্মা যতই নির্ম্মল হইতে থাকিবে ততই এই বাণী স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর শ্রুত হইবে। কিন্তু মানবাত্মা যতই কেন মলিন হউক না, ভিতরকার এই বাণী সকলেই অস্পষ্ট ভাবে শুনিতে পায়। কিন্তু কে তাহাকে গ্রাহ্য করে? পাপে প্রবৃত্ত হইতে আরম্ভ করিলে প্রথম নিশ্চয়ই প্রাণে আঘাত দিয়া কে জানায়— "ইহা করিও না"। অন্ধকারে লোক চক্ষুর অজ্ঞাতে এই আলোক নিশ্চয় অলক্ষিতে একবার পাপীর প্রাণে প্রকাশিত হয়। কিন্তু সে তাহা অবহেলা করে। পুনঃ-পুনঃ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানরূপ ব্রহ্মবাণী অবহেলা করিতে করিতে অবশেষে জীব পাপে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। এমন সুন্দর স্বভাবতঃ পবিত্র মানবাত্মাকে অপবিত্র রাখা কি স্বাভাবিক? যদি মানব সর্ব্বদা প্রাণের এই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান লক্ষ্য করিয়া প্রত্যাদেশ অনুসারে চলিতে চেষ্টা করে তবে নিশ্চয়ই সে পুণ্যজ্যোতিঃ লাভ করিতে সমর্থ হয়।

সমাপ্ত।

পণ্ডিতা কুমুদিনী বসু রচিত অন্যান্য গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঢাকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগের লাইব্রেরী পুস্তক ও হাইস্কুল সমূহের প্রথম চারি শ্রেণীর প্রাইজ পুস্তকরূপে গৃহীত।

"অমরেন্দ্র"

বর্ত্তমান সময়োপযোগী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। স্বদেশ ইহার ভিত্তি, স্বদেশী ইহার প্রাণ।

"বেঙ্গলী" লিখিয়াছেন :—This is an excellent novel based on facts of the present-day movements of the country......The facts are supposed to represent the every-day life of the educated Bengalee home and the authoress has, we are glad to find, done her work in an admirable manner. The book should prove

a valuable acquisition to our libraries, as it will give an idea how educated young men should devote themselves to the service of their country and country-men.

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত :—"চরিত্র গুলির পবিত্রতা মধুরতা ও উদারতা দেখিয়া বড়ই তৃপ্ত হইয়াছি। ভাষার মাধুরী ও উপমার বিশেষত্বও অতীব চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। দেশের নরনারী 'অমরেন্দ্র' 'প্রিয়নাথ' 'গিরিবালা' ও 'সুশীলার' আদর্শে জীবন গঠিত করিতে পারিলে আমাদিগের দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে, আনন্দের দিন আসিবে। এই গ্রন্থখানি গৃহে গৃহে পঠিত হয় ইহাই ইচ্ছা করি।"

প্রফেসার বিধুভূষণ গোস্বামী এম, এ, :—..."ইহা অসঙ্কুচিত চিত্তে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে এই শ্রেণীর উপন্যাস বাঙ্গালায় অতি বিরল। বস্তুতঃ "অমরেন্দ্র". বাঙ্গলা উপন্যাস জগতে এক অভিনব সৃষ্টি।"

প্রফেসার সতীশচন্দ্র সরকার এম, এ, :......in all respects socially, politically and religiously

the book is a great book by an internal and essential nobleness of its own, and is thus entitled to the highest regard."

হেরল্ড বলেন :—We are confident that the Bengali reading public will accord this book a fitting well-ground which it so richly deserves.

"ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ" :—The book is interesting and the plot highly absorbing. The style does credit to the authoress's literary skill."

"ঢাকা প্রকাশ"—ভাষা যেমন সরল মধুর ও বিষয়ের উপযোগিনী, বর্ণিত কাহিনীটিও তেমন কৌতূহল উদ্দীপক এবং সর্ব্বাংশেই হৃদয়হারিণী।

বাহুল্য ভয়ে সমস্ত সমালোচনা দেওয়া হইল না। মোট কথা "আনন্দ মঠের" পর এরূপ উচ্চশ্রেণীর উপন্যাস আজ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই।

পুস্তকের আকার প্রায় চারিশত পৃষ্ঠা। সোণালি অক্ষরে উৎকৃষ্ট বাঁধাই। মূল্য মাত্র দেড় টাকা।

——(০)——

আভা (কবিতা পুস্তক)

ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট, মূল্য ১।০।

"আনন্দ বাজার পত্রিকা" বলেন ঃ-

সমুচ্চ কল্পনা, ভাবের প্রগাঢ়তা, ব্যঞ্জনার সুদূরগামী ঝঙ্কার, ভাষার সুধামধুর প্রবাহ এবং সর্ব্বোপরি অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম জগতের অভিমুখে পাঠকের চিত্তামন্ত্রণ, এই কাব্য গ্রন্থ খানির প্রত্যেক পদ্যেই পরিলক্ষিত হইল।...শিক্ষা পাইলে নারী-জাতির প্রতিভা কত উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে, কত কোমল ভাষায় উচ্চতত্ত্বের পরিস্ফুট চিত্র আঁকিতে পারে 'আভার' প্রত্যেকটি পদ্যই তাহার অকাট্য প্রমাণ।

লহরী (কবিতা পুস্তক) মূল্য ॥০

সঞ্জীবনী বলেন ঃ—দুইজন কবির কবিতা ভিন্ন আর কোথাও তেমন উচ্চ অঙ্গের কবিতা পাঠ করি নাই।

ও

পঞ্চ-পুষ্প

পাঁচটি উৎকৃষ্ট চিত্তরঞ্জনকারী গল্পের সমষ্টি, 'সাহিত্য'-
ম্পাদক ইহার কোন একটি গল্প সম্বন্ধে লিখিয়া-
লেন ঃ—"মাসিক সাহিত্যে সাধারণতঃ যে সমস্ত গল্প
কাশিত হয়, সেগুলি অপেক্ষা এই গল্পটি উৎকৃষ্ট।"
হা অপেক্ষা উচ্চ প্রশংসা আর কি হইতে পারে? গল্প-
লি উচ্চ ভাব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত।—প্রকৃত সমাজ-
ক্ষক! প্রত্যেকটি গল্প ছবির মত উজ্জ্বল—ভাষার
ধুর্য্যে ভরপূর।

কাগজ ও ছাপা সুন্দর এবং গ্রন্থকর্ত্রীর ছবি সম্বলিত।

মূল্য আট আনা মাত্র।

—o—